No. 402

অস্ফুট

[ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেল বার্ষিকী।]



প্রথম বর্ষ

মাঘ ১৩৩৩।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে

আবুল ফয়েজ খান্ চৌধুরী

সম্পাদকদ্বয়।

প্রকাশক—
শ্রীবীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেল
রমণা, ঢাকা।

ঢাকা নয়াবাজার শ্রীনাথ প্রেসে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত

রজনীগন্ধার কোমল কচি পাপ্‌ড়িগুলি শিশিরে ভিজে চুপ্‌চুপে হ'য়ে যায়—তা'রা যেন গুমরে-কাঁদা রজনীর অশ্রু-ভেজা চোখের পাতা। প্রাণের আকুল তৃষ্ণা নিয়ে সূর্য্যমুখী সারটী দিন একদৃষ্টে আকাশের দয়িতের পানে তাকিয়ে থাকে—সূর্য্যের সমস্ত রশ্মির ঐশ্বর্য্য সে যেন আপনার বুকে টেনে আন্‌বে। উষার সলাজ গুমোটে নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিয়ে হেনা সাশ্রুনেত্রে প্রভাত-আলোর কাছে আপনার করুণ মিনতি জানায়। "অর্দ্ধস্ফুট" গোলাপটী পর্য্যন্ত আক্রান্ত-যৌবনা ষোড়শীর মত অতি মৃদুস্বরে প্রভাত-বায়ুর সাথে আলাপ ক'রে থাকে। "অস্ফুট" শুধু কুসুমের কারাগারে বদ্ধ হয়ে অদম্য আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে নিজে নিজে গুম্‌রে মরে। অসীম তা'র আশা, গভীর তা'র বেদনা, উদার তা'র প্রাণ, অনিন্দ্য তা'র সৌন্দর্য্য। সন্ধ্যার রন্ধ্রহারা অন্ধকারের বুকে সে প্রাণ মাতানো রসের ফোয়ারা সৃষ্টি কর্‌তে পারে, উষার শিশির-ভেজা বাতাসের বুকে সে প্রাণের কাঁপন লাগাতে পারে, অপরাহ্নের ঘাম্‌ঝরা প্রকৃতিকে সে রঙের ফোয়ারায় স্নান করিয়ে শান্তি ও প্রীতির সৌরভ-নিষেকে অভিষিক্ত ক'রে তা'কে অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে। তা'র প্রতিভা-সৌরভ কুসুমের কারাগার হ'তে মুক্ত হ'য়ে প্রকাশের অভিসারে বেরিয়ে পড়্‌তে উৎগ্রীব হ'য়ে আছে। "কুঁড়ির" ভিতরে অন্ধ হ'য়ে গুম্‌রে-কাঁদা গন্ধ আজ দখিণার নিবিড় আলিঙ্গনে আপনার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে সমুৎসুক। উদ্যানের নিভৃত কোণে রন্ধ্রহারা অন্ধকারে বদ্ধ বাতাসের উন্মত্ত কোলাকুলির মাঝে কলমের আঁচড়ে আঘাতে সে হাঁফিয়ে উঠেছে—আমরা তা'ই ছাপার আখরে তা'র প্রাণের বেদনা প্রকাশের অভিসারে পাঠাচ্ছি।

সূচীপত্র।

অস্ফুট

১ম বর্ষ { মাঘ—১৩৩৩ } ১ম বর্ষ

নমস্কার।

(গদ্য কবিতা)

(১)

অনন্ত নীল সমুদ্রের নিবিড় অসীমত্বের মধ্যে তোমার জন্ম, হে মনোহর! জ্যোৎস্না মথিত করিয়া জল স্থল আকাশের সব সৌন্দর্য্য ছানিয়া সব মাধুরী বুকে লইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য স্রোতে ভাসিয়া তুমি চলিয়াছ। নদীর গতি দিয়া, ফুলের গন্ধ দিয়া, বসন্তের আনন্দ দিয়া তোমার অপরূপ তনুর সৃষ্টি, তারাভরা অনন্ত নীলাকাশ তোমারই নীল বাস; পাহাড়ের মাথায় মাথায়, শাল গাছের পাতায় পাতায় তোমারই বুকের রক্ত-বিন্দু উপল-মণির মত জ্বলিতেছে; ওই শতচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জ তোমারই শীর্ণ বিশীর্ণ চূর্ণকুন্তল, গোধুলীর রাঙা আলো তোমার মুখে লোধ্ররেণু মাখাইয়া দিয়াছে; এই প্রান্তরভরা রাঙা আলো তোমারই বুকের আগুন; তোমার স্বপ্ন-অঞ্চল বনে, পর্ব্বতে, জ্যোৎস্নায় লুটাইতেছে, তোমারই অঙ্গের তরঙ্গে নানা ভঙ্গে লতিয়া লতিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তোমার দেহের সৌরভ পুষ্পে পুষ্পে আকুল হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; তোমারই চরণচাঞ্চল্যে ইটের রক্তে রাঙা পথের বুকে বাতাসের নৃত্য; তোমার টলমল ললিত যৌবন উচ্ছল বেগে নদনদী সরসীর বুকে ছল ছল করিতেছে; পদ্মে পদ্মে তোমারই আঁখির দৃষ্টি; চাঁদের আলো তোমারই চিররহস্যময় আনন্দহাসির অমৃতধারা। এই রূপের ঝর্ণা, বর্ণের ধারা, রসের ফোয়ারা, অপরূপ রঙের ঝোরা নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে, আমি ক্ষুধিত চোখ দুটী ভরিয়া আনন্দে অহর্নিশ তাহা পান করি। অপরিসীম সুখ, অজ্ঞানা বেদনা—বিশ্বের এই সৃষ্টিশক্তি প্রজাপতির পাখায় রঙীন করিয়া, ফুলের বুকে মধু ঢালিয়া, পাখীর কণ্ঠে

গান ভরিয়া, নারীর নয়নে মায়ার ফাঁদ পাতিয়া, কোটি কোটি তারায় ঝলমল চন্দ্রাতপতলে, সূর্য্যচন্দ্রের গমনাগমনের ছন্দে, ঋতুর পর ঋতু ফুলে ফুলে পা ফেলিয়া, জলে স্থলে কত শত রঙের উত্তরীয় উড়াইয়া তোমার যাত্রা। হে অরূপ! তোমাকে নমস্কার!

(২)

আমার চোখের সম্মুখে কত সুখ, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য্য, কত ছবি মূর্ত্ত হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে—খোকার হাসি, ছেলেদের খেলা, মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার চাহনি, গায়িকার সুরালোকদীপ্ত আননপদ্ম, জ্যোৎস্না-রাত্রে তরুণ-তরুণী, মাধবীকুঞ্জে প্রেমিক-প্রেমিকা, আষাঢ়-মেঘের ঘন সমারোহ, শ্রাবণ-সাঁঝের অশ্রান্ত অশ্রু বরিষণ, শরতের শ্যামশষ্পের বুকে অশ্রুবিন্দুর করুণ মিনতি, শীতের রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন—এই সমুদ্রস্তনিত সুন্দরী ধরণীর পটে রঙের ঝর্ণালতার অসীম আনন্দ-সৌন্দর্য্য তুলিকা দিয়া প্রাণের শিখায় কত রঙ-বেরঙের দাগ কাটিতেছ। তোমার তুলির টানে নব নব রূপরেখা আঁকিয়া, মুছিয়া আবার নূতন রঙ্গে আঁকিয়া—অসীম তুমি—অসীমের পথে চলিয়াছ; এক একটী পৃথিবী তোমার হাতের সৌন্দর্য্য-শতদলের এক একটী পাপড়ির মত ফুটিয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়ে। তোমার একহাতে সৃষ্টি আর এক হাতে লয়, এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, এক হাতে সুধা আর এক হাতে গরল, এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বজ্র। এই রূপের জগতে বস্তুপুঞ্জ তোমারই মোহন কাঠির স্পর্শে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, গলিতেছে, ঝরিতেছে, শূন্যে মিলাইয়া আবার নূতন নূতন ভাবে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে সুন্দর! তারাভরা আকাশের তলায় উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে রূপকথার রাজ্যে দুয়ার খুলিয়া, আমার অন্তরের অনন্তকালের ঘুমন্ত রাজপুত্র তুমি, জাগিয়া উঠ,—এ গিরিবন লঙ্ঘন করিয়া কোথায় কোন্ তেপান্তরের পানে উধাও হইয়া তুমি ছুটিতে থাক—অসীম তোমার আশা, দুর্জ্জয় তোমার শক্তি, দুর্গম তোমার পথ, অনন্ত কালের জন্য তোমার যাত্রা; পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে তোমার অনন্ত রথ-চক্রের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দের কম্পন রাখিয়া অনন্ত সৌরজগতে সুখ-দুঃখ, সৃষ্টি-লয়ের অকারণ ঝঞ্ঝা বহাইয়া, অনন্ত কালের যাত্রী, তুমি অনন্তের পানে চলিয়াছ। হে বিনোদ! উষার স্নিগ্ধ রঙিন চাহনিতে, সদ্যপ্রস্ফুটিত রজনী-গন্ধার তীব্র সৌরভে, ছোট শিশুর কচি প্রাণখোলা হাসিতে, মায়ের বুকভরা স্নেহে, প্রিয়ার চাহনিতে, কুহুর ছন্দে, নারীর চোখে, আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র তোমার অভিব্যক্তি। হে বিশ্বশিল্পী! তোমাকে নমস্কার!

(৩)

হে মনোহর! বিশ্বলীলাকমল হাতে করিয়া, কোন্ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তুমি হাসিতেছ। আকাশ বাতাস তোমার সেই হাসির হিল্লোলে চারিদিকে অপূর্ব্বমাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অপূর্ব্ব সুন্দর তোমার আনন-পদ্মে, চক্ষে, গণ্ডে কিসের দীপ্তি ঝলসিয়া উঠে।

মুখের রঙ কখনো পদ্মরাগের মত রাঙা, কখনো শুকনা পাতার মত কালো, কখনো পলাশের মত জ্বল্ জ্বল্; আমার মনের ছন্দে, গানে তোমার দেহ লীলায়িত। তোমার আঙুল—যেন আগুনের শিখা; সব চেয়ে সুন্দর তোমার সারঙ্গ নয়ন— কখনো হাসির আলো, কখনো স্বপ্নের মায়া, কখনো দীঘির কালো, কখনো মেঘের ছায়া। তোমার চক্ষু-তারকায় যে আলোর ফিনিক্ জ্বলিতেছে তাহা সূর্য্যের নয়, চন্দ্রের নয়, তারার নয়— বিদ্যুতের; তাহার দিকে চাহিলে সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়া উঠে। তোমার হাসির সুরে শুষ্ক রুক্ষ রক্ত-মাটী হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুলিতেছে, গাছে গাছে ফুল রঙীন হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঝর্ণার মৃদঙ্গ বাজিতেছে, নিশার মোহন রূপের ফোয়ারার ভিতর বিশ্বশতদললীনা অনন্ত-যৌবনা অনন্তউর্ব্বসীর জ্যোৎস্নাহাসির রঙের ঝোরায় বিশ্বের অঙ্গনতলে তোমারই কোটি কোটি রঙ-বেরঙের আরতি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। বিশ্বের বস্তুপুঞ্জে, মানব হৃদয়ের গহন কোণে, আনন্দে, সৌন্দর্য্যে, সবার উপর তোমার হাসির রঙের ধারা। অফুরন্ত তোমার রূপের ফোয়ারা, অফুরন্ত আমার হৃদয়-পেয়ালা, আমি ধন্য। হে সুন্দর! অবিশ্রান্ত রূপের স্রোতে ও অফুরন্ত রঙের ফোয়ারার মাঝে তোমার প্রসন্ন মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখিয়া আমার নয়ন মন সার্থক। হে বিশ্ববিধাতা! আমার ক্ষুদ্রতার ক্ষোভ ও অক্ষমতার ক্লেশ ঘুচাইয়া বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন রূপদানে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে আমাকে বিলাইয়া দাও। তরুন প্রাণের নিবিড় আবেগভরা অঞ্জলি বহিয়া আনিয়াছি আমি, হে অসীম! তোমার পায়ে উপহার দিতে। কচি প্রাণের কোমলতাসিঞ্চিত বড় কোমল লজ্জাবতীলতার মত নমনীয় আমি—হে সুন্দর! উষার রঙিন মাধুর্য্যে ও সাঁঝের নিঝুম মসৃণতার আস্তরণে তুমি আমাকে স্পর্শ কর। সেই স্পর্শে আমি উজ্জ্বল চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়া তোমার চোখে মুখে অপূর্ব্ব বর্ণবিভা ফুটাইয়া দিই। তুমি কামনার উদ্বেগে, নিষ্ফলতার নিশ্বাস প্রবাহে, অক্ষমতার ক্ষোভে, চিন্তার চঞ্চলতায় আমার হীনতা, দীনতা ও অক্ষমতা হইতে ক্ষরিত হইয়া অপূর্ব্ব মুর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠ। হে বিশ্বশিল্পী! তোমাকে নমস্কার!

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে।

রঙের হোলী।

(১)

রঙ জাফ্রান টুকটুকে লাল আবেশ বিভোল আস্‌মানে
নীল দরিয়ার রঙের জাহাজ দোল খেয়ে যায় আন্‌মনে
রঙিন সাঁঝে আকাশ গাঙে পানসী চলে পালবেয়ে
রঙ-মহলের রঙের ঝিলিক ছাড়্‌বে সে কি অল্পে এ!
আন্‌কো আলোর ঝর্ণা-ধারায় অপ্‌রাজিতার বুকদোলে
গন্ধ হাসে অঙ্গনেতে তুলসী তলে ধূপগলে।
কল্পনা আজ যাচ্ছে উড়ে হালকা হাওয়ায় কোন্ ধ্যানে
ঝাপ্‌সা সাঁঝে সুর চলেছে কোন রূপসীর সন্ধানে।

(২)

সিঁদুর মাখা ঝর্ণাধারায় নীলদরিয়ার বুকভরি
স্বপন্ কোটের দেব কনেরা মার্‌ছে রঙের পীচ্‌কারি।
নিখিল কবির দিলদরিয়া উথ্‌লে ওঠে তোর গানে
ও প্রকৃতি তোর গানে যে ফুল ফুটেছে অঙ্গনে;
ও গরবী ওই মুখে তোর প্রেমের বাণী তায় লেখা
ফাগুয়া ফাগে রঙিণ রাগে বিভোল আঁখি যায় দেখা।
পড়্‌তে নারি কি লেখা তোর জ্বল্‌ছে হোথা হৃদ্‌কোষে
চোখে আমি ঝাপ্‌সা দেখি আফ্‌সে মরি আফ্‌শোষে।

(৩)

ও প্রকৃতি রঙ-সায়রে রাখ্‌লি কি তোর গাল তাতে
কিংবা চুমোয় গাল দুটী তোর উঠ্‌লো রেঙে আলতাতে?
তোর বুকের ওই গোপন কোণের স্বপ্ন-জড়া ফুল বনে
মুগ্ধ ক'রে বিভোল ক'রে রাখ লুকিয়ে এই দীনে;

এ দুনিয়ার নোংরা চালে চল্‌ছে জীবন একটানা
তার মাঝে আজ উঠ্‌লো কি ঢেউ দখিণ হাওয়া দেয়হানা,—
বলক দিয়ে ক্ষীর-সায়রে পুলক ছোটে হর্ষেতে
কোন রূপসীর নিকষ প্রেমের কাঁপন লাগে স্পর্শেতে।

(৪)

দিন গোলামীর নিকাশ আজি চিত্ত নাচে উল্লাসে
বাতিল হল সব বকেয়া লাগ্‌ছে তারি জেল্লাসে,
বুক ভরে মোর নিকষ রাঙা শোণিত ওঠে চঞ্চলি'
হৃদ্ সায়রের অথই জলে উঠ্‌ছে ঢেউ কল্লোলি,
চম্‌কা রঙে ঝলসে দু-চোখ আজ এ ধরার খোসরোজে
প্রাণের টানে প্রিয়তমার অভিসারে চলছি যে।
ও দেমাকী তুই কি নাকি আলোর রাঙা স্বর্গপুর
অর্ঘ্য আজি ধর গো হাতে দুখের নিশা করগো দূর।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দে।

বন্ধুত্বের খাতির

(১)

প্রায় সকল ছেলেরাই আমাকে অহঙ্কারী বলিত ও একটু যেন বিতৃষ্ণার চোখে দেখিত। বাস্তবিক আমি অহঙ্কারী ছিলাম কিনা জানি না; কিন্তু আমার প্রকৃতিই যেন কেমন ছিল। আমি যাচিয়া কারও সঙ্গে পরিচয় করিতে পারিতাম না, করিতে ইচ্ছাও করিত না, করিবার সুবিধাও পাইতাম না।

ছোট বেলায় মা মরিয়া গিয়াছিলেন, বাবাই আমাদের দুই ভাই-বোনকে মানুষ করিতেন। বাবার এক ছোট বিধবা ভগ্নী ছিলেন। তিনিই আমার ছোট বোনটিকে আগলাইতেন ও আমাদের জন্য রান্না করিতেন। বাবাই আমাকে পড়াইতেন। তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ স্কুলে যাইতাম। তিনি ও ঐ পথে তাঁর আফিসে যাইতেন। ৪ টায় আফিস হইতে ফিরিবার পথে আমাকে আবার লইয়া আসিতেন। যেখানে যাইতে চাহিতাম তিনি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেন। বাহিরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না।

পড়ার উপর আমার খুব ঝোঁক ছিল। বাবাও আমাকে পড়া ছাড়া আর কোন কাজই করিতে বলিতেন না। খেলার সময় খুব কমই মিলিয়াছে, কেবল বৈকালে বাবার সঙ্গে ঘণ্টা দুই খোলা মাঠে বেড়াইয়া আসিতাম।

ক্লাশে আমি ছিলাম ফার্ষ্ট্ বয়। স্কুলে কোন সময় ছুটি পাইলে লাইব্রেরীতে যাইয়া পুস্তক পড়িতাম। অন্যসময়ে কোন ছেলে আমার সহিত গল্প করিতে পারিত না। এই সময়ে যদি কেউ আসিত তবে হয়ত পড়িতে পড়িতেই হাঁ-না ভাবে উত্তর দিতাম। তা'তে ছেলেরা আরও চটিয়া যাইত এবং আমার অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রাখিত। আমাদের ক্লাশের করিম আমাকে 'কূপ-মণ্ডূক' এই অদ্ভুত নামটি দিয়াছিল। তার একটু ইতিহাস আছে।—সেবার এক ম্যাজিকওয়ালা আমাদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাইতে আসে; তাসের 'ইস্কাবনের গোলাম' 'up' 'up' বলিলে কেমন করিয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, হয়ত বা করিম এবং আরও কয়েকটি ছেলের নিকট আমার এই অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে মনে করিয়াছিল —— সামান্য তাসের ম্যাজিক যে কোন দিন দেখে নাই, সে ঐ নাম পাইবার উপযুক্ত। তাহাতেই করিম আমার এই অদ্ভুত নামটি দিয়াছিল।

রাস্তায় ছেলেরা আমাকে দেখিলে এমনি ভাবে তাকাইত; ভাবটা এই রকম, যেন—— এইরে আমাদের ক্লাশের সেই ——। এমনি ভাবেই ক্লাশের বাহিরে এবং ভিতরে অদ্ভুত উপাধি এবং ছেলেদের অদ্ভুত ধরণের চাওয়াচাওয়ির মধ্য দিয়া আমার দিন কাটিতেছিল, কিন্তু

এরূপভাবে আমাকে বেশী দিন কাটাইতে হয় নাই। কারণ আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়া ফেলিলাম এবং প্রায় সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

(২)

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি। বাবার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ৩৫৲ বেতন এবং ২০৲ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বাবা আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এক আত্মীয়ের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম। আত্মীয়টি আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াই বাড়ী চলিয়া গেলেন!

বাবা বাড়ী হইতে আসিবার কালে কেবল একটি কথা বলিয়াছিলেন—'মন দৃঢ় কর।' মন দৃঢ় করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। কারণ বাবার নিকট হইতে সে শিক্ষা পাইয়াছিলাম। কিন্তু, তবুও প্রথমে যেন কেমন হইয়া গেলাম। রাস্তা দিয়া অসংখ্য লোক চলিয়াছে ; সকলেই যেন কোন্ অপরিচিত জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে। সকলের মুখেই ব্যস্ততার লক্ষণ,—যেন ইহারা ছুটিতেই থাকিবে, যেন ইহাদের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিন রাত্রি হাওয়া গাড়ী ও ট্রামের শব্দ, হঠাৎ এই জনতরঙ্গ এবং কল-কোলাহল-মুখরিত জায়গায় পড়িয়া মনটা যেন থাকিয়া থাকিয়া খাবি খাইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—যেন কত গভীর জলের মাছ অত্যন্ত কড়া-শুক্‌না ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হইয়াছি। কিন্তু এরকম ভাব বেশী দিন রহিল না, কারণ বাবার সেই 'মন দৃঢ় কর' কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

প্রথম যেদিন ক্লাশে ঢুকিলাম, দেখি – কত অপরিচিত মুখের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। বুঝিলাম এখানে স্কুলের সেই 'উপাধি' দিবার লোক নাই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচয় লইতে ব্যস্ত, কেবল আমি কারও সঙ্গে পরিচয় করিতে পারিলাম না। সেই 'যাচিয়া পরিচয়'করাটা তখনও বোধ হয় আমার প্রকৃতির বাহিরে ছিল, কিন্তু তবুও দুই একটি ছেলে আমার পরিচয় লইতে ক্ষান্ত রহিল না।

ক্লাশের মধ্যে একটি ছেলে ছিল প্রসিদ্ধ। উজ্জ্বল গৌরবরণ, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, দিব্যি চেহারা, পড়াশুনায় মোটের উপর সে ভালই ছিল। কিন্তু আরও মজবুত ছিল সে গল্পে এবং হাসি-খুসিতে। দেখিতাম ক্লাশে আসিলেই তাহাকে লইয়া ছেলেদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। তার নাম ছিল 'আমীর সেহাব উদ্দিন,'—সে ছিল এক জমিদারের ছেলে। কিন্তু ছেলেরা তাকে "আমীর" বলিয়াই ডাকিত। মুখের সঙ্গে পরিচয় থাকিলেও আমার সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় ছিল না। আমি messএ থাকিতাম, কলেজ হইতে আমাদের mess বেশী দূরে ছিল না। প্রায়ই হাটিয়া আসিয়া কলেজ করিতাম, তবে কোন দিন দেরী হইলে ট্রামে চড়িতাম।

স্কুলের মতই সেদিন Common-Ronm এ বসিয়া 'The Herald of the French Revolution' নামে একখানা পুস্তক পড়িতেছিলাম। পড়িতে পড়িতে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কখন কলেজের ছুটি হইয়া গিয়াছে এবং কখন কলেজের হট্টগোল থামিয়া গিয়াছে, কিছুই টের পাই নাই. যখন টের পাইলাম, তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অদূরে রাস্তার উপর গ্যাসের আলো জ্বলিতে বেশী বাকি নাই। এমন আঁধার হইয়া আসিয়াছে, যা আমি ঘরের মধ্যে electric light থাকাতে বুঝি নাই, মনে হইল যেন কে একটা খুব ঘন আঁধারের যবনিকা সমস্ত কলিকাতার উপর টানিয়া দিয়াছে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া দেখি নীচে একটা মটর দাঁড়াইয়া। বৃষ্টি ধরিলে যাইব কিনা ভাবিতেছি এমন সময়, কোথা হইতে আসিয়া, আমাদের ক্লাশের সেই 'আমীর' বলিল—"এস ভাই, আমার মটরে উঠে এস, আমি তোমাকে তোমার mess এ পৌঁছে দেব"। তাদের বাসা কলেজ হইতে বেশী দূরে ছিলনা। সে মটরে আসিত, তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু যার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই বলিলেই হয়, সে যে আমাকে এরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ করিবে, তাই আমি একটু আশ্চর্য্যের সহিত ভাবিতেছিলাম।

কিন্তু সে আমাকে ভাবিবার সময় দিলনা 'কেন ভাই বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, আমিও ত ঐ পথেই যাব, এস ভাই,' বলিয়া একরকম জোর করিয়া আমাকে মটরে তুলিয়া লইল এবং 'বাড়ী চালাও' বলিয়া সোফারকে হুকুম করিয়া দিল। বাধা দিলে সে বলিল, 'মেসে পৌঁছে দিলেই ত হল'? মটর চলিতে আরম্ভ করিলে সে বলিল, 'যদিও ভাই তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন কথাবার্ত্তা হয় নাই তথাপি আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম'।

আমি বলিলাম, 'যদিও আপনার সঙ্গে————' সে বাধা দিয়া বলিল, "আপনি' কেন ভাই, আমাকে তুমি 'তুমি' করেই বল'।

দুই একটি কথার পর মটর তাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল! বুঝিলাম জমিদারেরই বাড়ী বটে। তার পড়ার ঘরের মধ্যেই আমরা বসিলাম। আমদের আসার আগেই ঘরের মধ্যে আলো জ্বালা হইয়াছিল। সে একটি সোফার উপর বসিয়া পড়িল। একটি চাকর, কোথায় জানি গিয়াছিল, আমাদের কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমীরের পায়ের নিকট বসিতে যাইতেছিল, তাকে চোখের ইসারায় জলখাবার আনিবার অছিলায় সরাইয়া দিল। কিন্তু এটুকু আমার চোখ এড়াইতে পাড়িল না।

গল্প করিতে করিতে সে আমার বাড়ীর সব কথা শুনিয়া লইল। সেও যে বাপের একমাত্র ছেলে এবং তারও যে মা নাই তাও এর সঙ্গে জানাইয়া দিল।

জল খাবার পর আমাকে মটরে চড়াইয়া দিয়া বার বার করিয়া বলিয়া দিল যে, আমি যেন যখন ইচ্ছা তখন তার বাড়ীতে যাই এবং এটা যেন আত্মীয়ের বাড়ী মনে করি।

তার ব্যবহারে এবং কথা বার্ত্তায় এতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম যে একটা ভদ্রতা সূচক চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিলাম না। মটর চলিতে সুরু করিলে তার আজিকার এই পরিচয় এবং আত্মীয়তার বিষয়, কেমন ভোজবাজীর মত কি হইল ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাস্তা কাটাইয়া দিলাম।

নিজের ইচ্ছায় না হইলেও তখন হইতে প্রায়ই তার বাসায় যাইতে হইত। কিন্তু এই যাওয়াটা ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে—আমি না হইলে তার শনিবারে Botanical garden excursionএ যাওয়া এবং ছুটির দিনে কলেজ-স্কোয়ারে সাঁতার দেওয়া কিছুই ঘটিয়া উঠিত না। ক্লাশে আসিলেও সে আমার কাছে বসিত। তাহাতে আমাতে এমন ভাব হইয়া গেল যে আমরা ছেলেদের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িলাম। সকলে আমাদের 'মাণিকজোড়' নাম রাখিল। লোকে আমাদের সহোদর বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিল। মনে হইয়াছিল বুঝি এ বন্ধুত্ব চিরদিন এই রকম থাকিবে—কোন দিন ভাঙ্গিবে না। যার সঙ্গে আমার কোন দিন পরিচয় ছিলনা, সেই যে এতবড় পরিচিত এবং বন্ধু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তা পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু তখন জানিতে পারি নাই যে এই পরিচয় হইতে আত্মীয়তা এবং আত্মীয়তা হইতে বন্ধুত্ব-সূত্র ভবিষ্যতে কোন্ মায়ার প্রভাবে এবং কিসের নেশায় বুদ্বুদের মত উড়িয়া যাইবে! কে জানিত, কলেজের দিনের এই আত্মীয়তা ভালবাসার কথা, ভবিষ্যতে যখন এমন এক দিন আসিবে, তাহার নিকটে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেও পারিব না! তার কাছে নিজের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিব!

(৩)

সাত বৎসর পরের কথা। এম, এ পাশ করিবার পর, কোন চাকরী-বাকরী না পাইয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিলাম। বাবা ছোট বোনটিকে বড় করিয়া, আমি যখন sixth year এ পড়ি তখন, তাহার বিবাহ দিয়া মারা যান।

সে বার জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে আমাদের বাড়ী হইতে ক্রোশ পাঁচেক দূরে আমার মামার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে গিয়াছি, অত্যধিক আদর পাইলাম।

সেদিন সকালবেলা বাহিরের ঘরের বারান্দার উপর বসিয়া প্রাতর্ভোজন সারিয়া মামা ও আমি ঐ গ্রাম সম্বন্ধেই গল্প করিতেছিলাম। গ্রামের জল-বায়ু, হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বই জানিয়া লইতেছিলাম। মামাও যথাযথ ভাবে উত্তর দিতে ছিলেন। জমিদারের কথা বলায় তিনি হঠাৎ খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন 'গ্রামের সবই ভাল বটে কিন্তু এখানকার নূতন জমিদার ভয়ানক অত্যাচারী', একটু থামিয়া বলিলেন, 'এ গ্রাম

অল্প দিনের মধ্যে উচ্ছন্ন যাইবে। এঁর কাছে কোন বিচার-আচার পাবার যো নাই। শুনিয়াছি তিনি সব সময় নাকি গান-বাজনা, মদ— এই সব লইয়াই থাকেন। এতদিন কলিকাতায় ছিলেন; হঠাৎ কেন যে গ্রামের বাড়ীতে আসিলেন তিনিই জানেন' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। জমিদারের নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "নাম সেহাব উদ্দিন চৌধুরী। শুনিয়াছি তিনি খুব লেখা পড়া জানেন।" নাম শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। প্রায় বৎসর খানেক হইল কলেজের সেই 'আমীর সেহাব উদ্দিনের' কোন সংবাদই পাই নাই। Fifth year এ যখন সে পড়ে তখন তার বাপ মারা যান এবং সেও পড়া ছাড়িয়া দেয়। পড়া ছাড়ার পরেও তার সঙ্গে আমার সেই ভাবই ছিল। এম, এ পাশ করার পর গ্রামে বসিয়া মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাইতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কেন যে তার চিঠি কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং শেষের দিকে, কেন জানি না, চিঠি লিখিলেও তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, বুঝিতে পারি নাই। নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইবার দরুণ তার কোন সঠিক খবর জানি নাই। এই এক বৎসরের মধ্যে তার কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ তার নামের মত নাম শুনিয়া সব কথাই মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ভাবিলাম দুই জনের কি এক নাম হইতে পারে না? আবার ভাবিলাম তার নামের আগে 'আমীর' ছিল, এ সে নয়। আবার সংশয় হইল, এ জমিদার, সে ও জমিদার ছিল,—তার নামের মত নাম,—এ যদি সেই হয়! 'এ যদি সে হয়' ভাবিয়া কিছুই মনে মনে উত্তর ঠিক করিতে পারিলাম না। তবে এটা ঠিক করিলাম যে এই জমিদারের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

মামার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না, আমার ভিতরকার চিন্তার কথাও প্রকাশ করিলাম না। কেবল 'জমিদার কোন্ গ্রামে থাকেন' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'আর একটা গ্রাম পারেই তাঁর বাড়ী'। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তুই তাঁকে চিনিস্ নাকি? তিনি কলিকাতার কোন্ কলেজে পড়িতেন। তুই দেখা কর্‌তে চাস্?' আমি একটি কথাও বলিলাম না দেখিয়া, তিনি নিজেই কিছুক্ষণ মৌন রহিয়া বলিলেন, 'তুই আর কি দেখা করবি। তাঁর দেখা পাওয়াই ভার। তিনি কারও সঙ্গে প্রায়ই দেখা করেন না' বলিয়া উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে ঠিক করিলাম বাড়ী যাওয়ার পূর্ব্বে চাকুরীর উমেদারী সম্পর্কে জমিদারের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাই ই। অন্ততঃ মানুষটা ত যাচাই করিতে হইবে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া মেঘ করিয়া ছিল। বৈকালে সরু পথ ধরিয়া, আল ডিঙ্গাইয়া দেখা করিতে চলিয়াছিলাম। হঠাৎ মেঘের মধ্য হইতে সূর্য্যের একেবারে ডুবিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেকার শেষ আরক্ত আভাটুকু আধ-পাকা ধানের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। জোরে হাওয়া বহিতেছিল, কখন যে বৃষ্টি আসিবে ঠিক ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম।

মাঝের গ্রামটি পার হইয়া একটি বড় রাস্তার উপর আসিয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা

করিলাম, 'বাপু, এ গাঁয়ের জমিদারের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পার?' সে আমার মুখের দিকে এমন করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল যেন আমি তাহাকে কিছু খুব খারাপ কথা বলিয়াছি। 'এই পথে যাও, তাহলে পাবা' বলিয়া সে এক রকম দৌড়াইয়াই সরিয়া গেল। আমি আরও কি বলিতে যাইতেছিলাম কিন্তু তখন সে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

ঐ পথে কিছু দূর চলিয়া একটি বড় বাড়ী দেখিতে পাইলাম; কাছেই একটি লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে 'এই জমিদারের বাড়ী' বলিয়া দেখাইয়া দিল।

চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীরের মধ্যে বাড়ী। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। গেটের কাছে 'গোরখপুরী' দারওয়ান দেখিলাম, গেটের নিকটে দাঁড়াইতেই সে যেন পাগলা কুকুরের মত দৌড়াইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কিয়া মাঙ্‌তা হ্যায়?' জমীদারের সঙ্গে দেখা হইতে পারে কিনা বলিলে, সে উত্তর করিল, 'সাব ত হিঁয়া নাহি রহ তা'। রশি দুই দূরে একটি বাড়ী দেখাইয়া বলিল, 'ঐহি সাবকা খাস মোকান হ্যায়।' আর কিছু না বলিয়া ঐদিকে চলিলাম। তখনও দিনের আলো নিভিয়া যায় নাই। তাহাতেই বুঝিলাম ঐটি ঠিক বাড়ী নহে, একটি 'বাঙ্গালা'। চতুর্দ্দিকে তারের বেড়া। হয়ত আগে বাগান ছিল, কিন্তু দুই একটি শুষ্ক গাছ ছাড়া এখন কিছুই নাই। গেট ঠেলিয়া, অপরিসর কাঁকর-মাটী মিশানো পথ বাহিয়া যখন 'বাঙ্গালার' বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন উপরের তালায় কে যেন হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল; নীচে কাহাকেও দেখিলাম না। একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম —— জমিদার। একটি বড় ঘরের মধ্য হইতে সামান্য একটু আলো আসিতেছিল। বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বুঝিলাম মামার কথাই ঠিক।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। বারান্দার একটি টুলের উপর বসিয়া 'কি করিব' ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ উপরের বাজনা বন্ধ হইয়া গেল, এবং কিছু পরেই আমার নিকটেই পাশের কামরা খুলিয়া একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। প্রথমে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে বোধ হয় কোন কাজে নীচে আসিয়াছিল। সে চলিয়া যায় দেখিয়া তার নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতেই সে যেন একটু কেমন হইয়া গেল, তা ঐ স্বল্প আলোর মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম সে বোধ হয় সাহেবের পশ্চিমা মুসলমান খানসামা হইবে। তাজ্জব হইয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কি চাই। সাহেবের সঙ্গে দেখা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'সাহেব কিসিকা সাৎ মোলাকাত্‌ নেহি কর্‌তা হেঁ।' আমি বুঝাইলাম যে সাহেবের সঙ্গে আমার বহুৎ দোস্তী আছে। তখন সে আমার নিকট হইতে 'কার্ড' চাহিয়া বসিল। কাগজ কালী চাহিলে সে আমার আপাদ মস্তক একবার বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কাগজ কালী আনিয়া দিল। নাম-লিখিত কাগজটুকু লইয়া সে উপরে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। প্রায় মিনিট বিশেক পর আসিয়া সে জানাইয়া দিল

যে 'সাহেবের সাথে মোলাকাৎ নেহি হোগা, সাহেব আরাম কর্‌তা হ্যায়'। আমি হাল ছাড়িলাম না। বুঝাইলাম, যেহেতু সাহেব আমার আত্মীয় হয়, সুতরাং উপরে গিয়া দেখা করিলেও কোন দোষ নাই। সে, ভদ্র-পোষাক পরিহিত দেখিয়াই হউক কিম্বা আত্মীয়তার দোহাই মানিয়াই হউক, কি ভাবিয়া শেষে লইয়া যাইতে সম্মত হইল। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া একটি বড় ঘর দেখাইয়া দিয়া সে অন্য দিকে সরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে বেশ উচ্চ হাস্য শুনা যাইতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইলাম। মেঝে-জোড়া কার্পেট পাতানো। খুব বড় একটি ঝাড় লণ্ঠন ঠিক ঘরের মাঝখানে জ্বলিতেছিল। ঘরের একধারে সর্ব্বপ্রথমে যার উপর চোখ পড়িল সে একটি যুবতী——গ্লাসে মদ ঢালিতেছিল। আমাকে দেখিয়া কুণ্ঠিত চিত্তে মদ ঢালা বন্ধ করিয়া গ্লাস নামাইয়া রাখিল। একটু দূরে বৃত্তাকারে চার পাঁচ জন লোক দরজার দিকে পিঠ করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। যুবতীটি কি যেন বলিল, শুনিতে পাইলাম না। সকলে এক সঙ্গে মুখ ফিরাইতেই যাহাকে দেখিলাম, তাহাতে একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এ 'সেই' আমীর সেহাব উদ্দিনই বটে।

সে আমার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে চিনিতে পারিল কিনা জানি না, 'তুমি কেমন ছোট লোক হে? বলে দিলুম দেখা হবে না, তবুও এসেছ কেন? চাকর ডাকতে না হয়, ত মানে মানে বেরিয়ে যাও।' যারা কাছে বসিয়াছিল একত্রে বলিয়া উঠিল, 'একেবারে ছোট ————, একেবারে ছোট ——'। আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। বড়ই দুঃখ হইল যে অমন সুন্দর চেহারা একেবারে কাল ছাইয়ের মত হইয়া গিয়াছে, আর মধুর চরিত্র এত তিক্ত হইয়া গিয়াছে। আমার চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, 'ওগো, তোমার সঙ্গেই যে আমার সব চেয়ে বেশী খাতির ছিল'। কিন্তু একটি কথাও কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নীচে আসিলাম। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এমনি এক বৃষ্টির দিনেই তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় মনে পড়িয়া গেল এবং তেমনি এক বৃষ্টির দিনেই এতদিনের সেই সূত্র আজ ছিন্ন হইয়া গেল। সমস্তই বিষাক্ত মনে হইতেছিল, ঐ বৃষ্টির মধ্যেই ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।

মহম্মদ গোলাম ছোবহান।

———

অর্থনীতির এক দিক।

মোটামুটী বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীতেই অর্থনীতি শাস্ত্রের জন্ম হয়। অর্থনীতি যে মানুষের জীবনের একটা সারাংশ নিয়া ক্রিয়া করে, ইহা যে সভ্যতার একটা বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ করে ইত্যাদি ব্যাপার নিয়া সম্প্রতি খুবই নাড়াচাড়া হইতেছে। অর্থনীতি মানুষের বৈচিত্র্যময় কার্য্যপ্রণালী, দৈনন্দিন জীবনের চিরপরিবর্ত্তনশীল ভাবভঙ্গী অতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে। "Matereali-stic conception of history" এই নূতন মতবাদ আজ নূতন করিয়া মানুষের বিচার শক্তিকে সজোরে আঘাত করিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যাপার ও জটীল সমস্যার সমাধানের উপরই ইতিহাসের ভিত্তি অনেক দিন স্থাপিত। জাগতিক সভ্যতার "তিকে একটা খুব impetus দিতে পারিয়াছে নূতন রকমের অর্থনৈতিক সমস্যা। ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যাও যে মানুষকে কম নাড়া দিয়াছে এমন নয়। কিন্তু জীবনকে নানাদিক দিয়া আলোড়িত করিয়াছে এই অর্থনৈতিক সমস্যা। ধন-সম্পদ চিরকালই মানুষকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। প্রকৃতি যেইখানে মানুষকে প্রচুর সুযোগ দান করিয়াছে সেইখানেই মানুষ স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিয়াছে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রকৃতির কোলেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা লালিত পালিত হইয়াছে। প্রাণরক্ষার উপযোগী যথেষ্ট মাল-মশলা যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই মানুষের চিন্তাশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সভ্যতার কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে। আর এই ইতিহাসকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে মূলতঃ অর্থনৈতিক ব্যাপার।

অর্থনীতি মানুষের জীবনকে অনেকখানি সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে পারে। এই জীবন নিজেই যে একটা অতি বড় সমস্যা একথা অর্থনীতিবিদ্ স্বীকার করে। বহুরূপী সমস্যার সমাধানকল্পে অর্থনীতি নানা ভাবে সাহায্য করে। ইহা মানবজীবনকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত করিয়া তোলে। মানুষ কিছুতেই আত্ম-সর্ব্বস্ব জীবে পরিণত হইতে পারে না। স্বভাবতঃ সে অন্যের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করে। মানুষ কেবল নিজের কথাই ভাবে ইহা বলিতে গেলে তার উপর খুবই অবিচার করা হয়। তার আত্মোন্নতির চরম ও পরম উদ্দেশ্য হইল সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও রমনীয় করিয়া তোলা। ব্যক্তিগত উন্নতির উপরই সমষ্টিগত উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। সামাজিক জীবনকে কি ভাবে সরস, সজীব, স্থিতিস্থাপক ও মধুর করা যায় অর্থনীতি সে পথও নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। "It necessarily involves the scientific examination of the structure and organisation of the community or communities in question; their history, their customs, laws and institutions ; and the relations between their members ; in so far as they affect or are affected by this department of their activity." (Encyclopaedia Britannica)

তাহা হইলে দেখা যায় অর্থনীতি সামাজিক জীবনের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। "Economy is the art af making the most of life" (Bernard shaw) এর মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। জীবনকে পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে অর্থনীতি কতটুকু অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, ইহাকে সম্পন্ন ও শ্রীমান্ করিয়া তুলিতে অর্থনীতি কতটুকু সাহায্য করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। দারিদ্র্য যে মহাপাপ একথা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ইহার সত্যতা যখন আমরা খুব ধীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি ও দারিদ্র্যকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতে শিখি তখন আমরা বুঝিতে পারি অর্থনীতি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কি করিতে বলে। দুনিয়ার যত বিরোধ সবের মূলেই বিকট অর্থনৈতিক সমস্যা মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারই বলি আর যাই বলি, পৃথিবীর বর্ত্তমান অশান্তির মূলে রহিয়াছে একটা বিরাট একক অর্থসমস্যা। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আজ সামাজিক সমস্যার মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই প্রায় একরূপ সমস্যা সমাজের অস্তিত্বকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় সব রোগের প্রতিকার প্রায় একই রূপ ঔষধ প্রয়োগে করা যায়। জগতের অর্থনৈতিক স্বার্থ দিন দিন একমুখী হইতে চলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে চলিয়াছে। এক জাতি অন্য জাতিকে exploit করিবার দুষ্ট প্রবৃত্তি যেন ক্রমেই দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। চালবাজী না করিয়া যাহাতে একটা Universal Economic Federationএর আদর্শে পৌঁছানো যায় তার জন্যই যেন বর্ত্তমান জগতের চিন্তাশীল জাতিসমূহ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ আশা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত অর্থনীতির ভিতর দিয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক মহাসম্মিলনীর উদ্ভব সম্ভব হইবে। সব দেশেই আজ নিজেদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। Politicsএর ক্ষেত্রে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির একটু দূর সম্বন্ধ। International Politics যে কোন দিন জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারিবে এরূপ মনে হয় না। Economicsএর ক্ষেত্রে কিন্তু সে সব বিরোধ নাই। প্রত্যেক দেশ ও জাতিই নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অন্য দেশ বা জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। জাতি সমূহের মধ্যে সহযোগিতা জগতের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেকখানি বৃদ্ধি করিবে। অর্থনৈতিক সমস্যা পরস্পরের মধ্যে মিলনের পথ খুবই প্রশস্ত করিয়া দেয়। মনে হয় ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক মিলনের প্রয়োজনীয়তা আরও সুতীব্র ভাবে অনুভূত হইবে। 'The love of Economy is the root of all virtues." (Bernard shaw) অর্থনৈতিক বিষয়ে যাহারা

চিন্তা করে তাহারা মানুষের বৃহত্তম মঙ্গলের কথাই মনে মনে পোষণ করে। মানুষ কি ভাবে জীবনে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ পায়, কি ভাবে তার অন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হয় ইত্যাদি শুভ সংবাদ যে তাহাকে দিতে পারে তাহার মূল্য একজন নীরস দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসাকারী অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। মানব জীবনের বহির্ভাগেই প্রথমতঃ আমাদের দৃষ্টি পড়ে। ইহাকে সুসজ্জিত করিতে পারিলে অন্তর্দ্দেশ সংস্কার করিবার পথ খুবই সুগম হইয়া উঠে। ক্ষুধার্ত্তের নিকট ধর্ম্মালোচনার কোন মূল্য আছে কি?

অর্থনীতি এক হিসাবে বিজ্ঞান। যে হিসাবে আমরা অন্যান্য বিজ্ঞানালোচনাকে সত্যের বিশ্লেষণ ধরিয়া নিয়া সাহিত্যের গণ্ডীভূত করিতে চাই—এস্থলেও তাহা অতি সহজেই করা যায়। সাহিত্য মাত্রই কাজের কথা বলে। জীবনের হর্ষ, বিষাদ, শোক, আনন্দ ইত্যাদির প্রতিধ্বনিই এই সাহিত্য। অর্থনীতিতে আমরা হীন, বঞ্চিত জীবনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। Bolshevism, Socialism, Communism, ইত্যাদি আন্দোলন আর্ত্ত, বঞ্চিত, অবজ্ঞাত জনসমাজের ব্যথার করুণ কাহিনী সর্ব্বসম্মুখে প্রচার করিয়া বেড়ায়। কি ভাবে সমাজের নিম্নস্তরের স্পন্দনহীন জীবনকে জগতের অশেষ মঙ্গলোৎস করা যায়, কি ভাবে তাহাদিগকে সমাজের কাজে লাগানো যায় ইত্যাদি বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিবে অর্থনৈতিক সাহিত্য। এখানে খাঁটি সাহিত্যের জন্য কত বড় উপাদান ও বহুমূল্য সম্পদ নিহিত আছে। আমাদের সাহিত্যকে অর্থনীতি একটা নূতন রূপ দিতে পারে। অর্থনীতি যে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবে তাহা জীবনের বিষাদের গানই গাহিবে। প্রবল দুঃখবাদই এ সাহিত্যের মূলমন্ত্র হইবে। আশার বাণীও যে তথায় না থাকিবে এমন নয়। একদল চিরসুখী, অন্যদল চিরনির্য্যাতিত—অর্থনৈতিক এই যে বৈষম্য এর কোন সমাধান হইতে পারে কিনা তারই মীমাংসা এ সাহিত্য করিতে চেষ্টা করিবে।

আনোয়ার হোসেন।

"মা"

আজ ছয় বৎসর তাদের বিয়ে হয়েছে। তারা দুজনাই দুজনকে ভালবাসে। একটা মোহময় স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাদের দিনগুলো কাটছিল। এ কয়বৎসরের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও তারা কেউ কারো কাছ ছাড়া হয়নি। আজ তিন বৎসর হইল তাদের সর্ব্বপ্রথম স্নেহের পুত্তলি ডল ঘরে এসেছে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

এ সংসারে নাকি সুখ কারোই একচেটিয়া নয়, তাই বোধ হয় তাদের দেশ আক্রমণ করলে বৈদেশিক শত্রু, আর গেথাইরিণকে যেতে হ'ল যুদ্ধে—স্বাধীন দেশের লোক কিনা!

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

আত্মিয়েরা গেথাইরিণের মৃতদেহ কাফিনে আবৃত করে নিয়ে এল তাদের ক্ষুদ্র কুটীরে।

হেলেনা একটুকুও কাঁদলেনা, শুধু মৃত স্বামীর পদতলে কাঠ হ'য়ে বসে রইল। এদেখে তার আত্মীয়েরা ভয় পেয়ে গেল—তারা বলতে লাগল—'হেলেনা, তুমি কাঁদো—তুমি কাঁদো, নইলে বাঁচবে না!' এর জবাবে সে শুধু সকরুণ উদাস দৃষ্টি নিয়ে তার ডাগর চোখ দুটী মেলে চাইত—তার অর্থ বোধহয় এই যে "আমার আর বেঁচে কি হবে!"

তার আত্মিয়েরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। এমন সময় এক বৃদ্ধা আত্মিয়া ডলকে এনে হেলেনার কোলের উপর ছেড়ে দিলে। হেলেনা ডলকে বুকে চেপে ধরে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল—"বাছা, তোর জন্যে আমায় বাঁচতে হবে—হাঁ আমায় বাঁচতেই হবে।"

শ্রীমাখনলাল কর চৌধুরী।



পোষ্যপুত্র

ভবলীলা হায় সমাপ্ত প্রায়
ডাকাডাকি করে আশী
শিথিল হ'য়েছে দেহের চর্ম্ম
বিদায় দিয়েছে গৃহের কর্ম্ম
ক্ষণিক শ্রমেতে গলদঘর্ম্ম
দেহ-পিঞ্জরবাসী।
চিরদিন তরে সকল দন্ত
লয়েছে বিদায়, করিয়া অন্ত
আপনার কাজ এ পর্য্যন্ত
দৃষ্টিশক্তি সহ।
দীর্ঘ এ'কাল নিঃসন্তানে
কেটেছে দোঁহার ভগ্ন পরাণে
এ'যাতনা আরো জীবনাবসানে
হ'য়েছে দুর্ব্বিসহ।
বসিয়া নিকটে প্রৌঢ়া গৃহিণী
বীণা নিন্দিত মধুর ভাষিনী
কহিলা গরবে স্বামী গরবিনী
মরমন্তুদ ভাষে,—
"ওগো আমরা যে নিঃসন্তান,
নিষ্ফল হয় জীবনাভিযান,
রেখেছি সাজায়ে এ' ছার পরাণ
এ' ভবে কিসের আশে" ?
বলিতে বলিতে হইল রুদ্ধ
কণ্ঠের স্বর, নিমেষ মধ্য
কাতর করুণ নয়ন শুদ্ধ
ভরি' উঠে আঁখি জল ;

উথলি' উঠিল শোকের সিন্ধু,—
ছাইল বিষাদে বদন-ইন্দু ;
ঝরিয়া অশ্রু দু'এক বিন্দু
চুম্বিল ভূমিতল।

হেরিয়া আমার মুগ্ধ পরাণ
করুণা সলিলে হ'ল ভাসমান,
বস্ত্রাঞ্চলে মুছা'য়ে নয়ান
কহিলাম মধু মুখে,

"কভু নহে ইহা মানব-সাধ্য
দিয়াছেন যাহা বিধি আরাধ্য
লইয়া তাহাই হইয়া বাধ্য
থাকিতে হইবে সুখে।

বিধির হাতের স্নেহময় দান
লভিতে যখন পারেনি পরাণ,
সহিব নীরবে ; আছে ভগবান
জীবনে সকল কাজে।"

"মিছে বোধ আর মানেনা পরাণ"।
—উত্তর হ'ল বজ্র সমান,
বুঝিবা প্রলয় বাধে ভগবান,
এখনি নিমেষ মাঝে।

কহিলা ভামিনী সুস্বর ঢেলে,—
"বুদ্ধি তোমার বড়ই সেকেলে,
রহমতপুরে বসুদের ছেলে
পোষ্যপুত্র আনো।

নতুবা মৃত্যু-অন্তে দোঁহার,
সব সম্পদ হবে ছারখার,
বংশের বাতি রহিবেনা আর,
ইহাও কি নাহি জানো" ?

কহিলাম "ছি ছি একি কহ ছাই ?
মোদের দয়ার আর কেহ নাই ?
বন্ধুদের ছেলে কি আপন ? তাই
কিছুই বুঝিতে নারি।

হের চারিধারে কত দুখী-দীন,
অনাথ আতুর আশ্রয়হীন
তাহাদের তরে আয়োজন ক্ষীণ
করেছি জীবন ভরি।"

ক্রুদ্ধা ফণিনী কহিলা শুনিয়া
কর-পল্লব কপোলে হানিয়া,
"নিবে দু'জনারে নরকে টানিয়া
শ্রাদ্ধ না হয় যদি।

এত ঘটা করে ও গাঁয়েতে তাই,
পোষ্য নিয়েছে বিরাজ গোঁসাই ;
অপুত্রকের নরকেতে ঠাঁই,
সর্ব্বশাস্ত্রে বিধি।"

কহিলাম আমি নম্র বচনে
নচেৎ কে জানে কি ঘটে সেক্ষণে—
"পরের পুত্র না আনি ভবনে
যা' আছে করিব দান।

তাহাদেরি শুভ আশীষ-উক্তি
নরক হইতে আনিবে মুক্তি,
এ' কথা কহিনু পূর্ণ যুক্তি,
করি' দেখ অনুমান।

বৃথা তব এই অলীক স্বপন,
পরের ছেলে সে হয় না আপন,
তার চেয়ে এই বিভব ভবন
দীনহীনে কর দান।"

সরোষে মানিনী কহিলা "এ সবে
প্রবোধ আমার কভু নাহি হবে,
পোষ্যপুত্র লহ, নয় তবে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ।

বন্ধুদের ছেলে প্রিয়দর্শন
মন্ত্রের বলে করিব আপন,
বসন ভূষণে করিলে যতন
ভুলিবে আপন মায়।"

কহিনু সভয়ে, "মার সন্তান
কেমনে করিবে অন্যেরে দান ?"—
বৃথা এ প্রয়াস, অশ্রুর বান
যুক্তি ভাসায়ে, যায়।

*   *   *   *

পরের পুত্র হইয়া আপন
সন্তান-সাধ করিবে পূরণ,
করিছে তাহার মহা আয়োজন
গৃহিণী আপনি সাজি',

তাম্বুল-রাগ রঞ্জিতাধর—
চকিতা বিজলী অম্বুদোপর !
বেণী-বন্ধনে ভয়ে থর থর
বিরল অলকরাজি,

কণ্ঠে উজল-হিরক-কিরণ,
শিথিল অঙ্গে রত্নাভরণ,
অপরের ছেলে করিতে আপন
হ'ল বহু সাজ সজ্জা।

গোপনে থাকিয়া হাসে ভগবান,
কোন পিতামাতা কঠিন-পরাণ
সন্তানে করে অন্যেরে দান
নাহি কিরে ঘৃণা লজ্জা ?

কিসের বাদ্য গৃহে মোর আজ ?
কেন উৎসব মঙ্গল-কাজ ?
কিসের লাগিয়া হেন মহা সাজ—
ভাবিতে কাঁদিল প্রাণ।

বিধবা রমণী বন্ধুর গৃহিণী,
দীনা দরিদ্রা চিরঅনাথিনী,
অর্থের মোহে অভাগী জননী
শিশুরে করেছে দান।

দাঁড়াইয়া আজ অঙ্গন-কোণে,
জনমের মত শেষ দরশনে,
বক্ষে ধরিয়া জীবন-রতনে
চেয়ে আছে মুখপানে,

উছল অশ্রু-সলিলে ভাসিয়া
ধরে বারবার বক্ষে চাপিয়া,
শিশু আধ আধ মা বলি' ডাকিয়া
তুষিছে আকুল প্রাণে।

হেরি নিদারুণ দৃশ্য এ হেন
অন্তর মোর টুটে যায় যেন,—
মানব হইয়া নির্দ্দয় কেন
বনের পশুর মত ?

অনাথার কোল করিয়া রিক্ত
দুখিনীর আঁখি করিয়া সিক্ত
এ নিঠুর পাপে হইয়া লিপ্ত
নরক ভুগিব কত ?

কহিলাম ডাকি থেমে যা'ক সব
আনন্দ-গান হাসি-কলরব
প্রাণ লয়ে খেলা, হীন উৎসব ;
মানুষের নহে কাজ ;

পূজা-আয়োজন হউক বন্ধ,
ফেলে দাও দীপ অগুরু-গন্ধ,
দীনের পূজায় পরমানন্দ
লভিব ভুবন মাঝ।

সহসা আমার এ আদেশ শুনি'
শঙ্খ ঘণ্টা থামিল অমনি,
মূর্চ্ছিতা ভূমে পড়িলা গৃহিণী
পূজার আসন তলে।

অঙ্গন কোণে শিশুর জননী
চাহে বিস্ময়ে চকিতা হরিণী
খেলিল পরাণে আমার দামিনী
নয়ন ভরিল জলে।

বাহু বন্ধনে শিশুরে বাঁধিয়া
অসহায়া নারী উঠিল কাঁদিয়া
কহিনু তাহারে ধীরে প্রবোধিয়া
'ফিরে যাও তব গেহে,

সন্তান তব রহিবে তোমার
তবু হেথা তার রবে অধিকার
পালিব নিঃস্ব জনে অনিবার
সন্তান-সম স্নেহে।'

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

"গল্পগুচ্ছ"

তুলির আঁচড়ে ভিতরের নিতান্ত সত্য নিতান্ত গুহ্য মানুষটীকে সজীব ক'রে সুন্দর করে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলবার যে শক্তি তা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব হলেও তার উপর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার খুব বড় বুকজোড়া অধিকার (Influence) আছে। শিল্পীর ভিতরে একটা শক্তি নিহিত আছে—যা'ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং স্বাভাবিক সুতরাং তার নিজস্ব—যে শক্তিবলে সে দুটো তুলির আঁচড়কে একত্র ক'রে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে একটা কাঠাম (Foundation) খাড়া কর্‌তে পারে। কিন্তু সেই কাঠামের উপর প্রতিমা গড়ার শক্তি এবং সেই প্রতিমার উপর রঙ ফলানের শক্তি সে পেয়ে থাকে—বিশ্ব প্রকৃতির নিকট হতে—তার পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়ার তরফ্‌ হ'তে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলেই বাহিরের আগুনের স্পর্শেই সে জ্বলে উঠে; পাথরের উপর বাহির হতে আগুন রাখলে সে ক্ষণকালের জন্য তে'তে উঠে মাত্র—জ্বলে না বা জ্বল্‌তে পারে না। এই ভিতরের আগুনটা নেহাৎ স্বাভাবিক হলেও তাকে একান্ত নিছকরূপে সত্য করে তোলে—সাহিত্য। যে বিপুল শক্তি বালক রবীন্দ্রনাথের বালকহৃদয়ের মাঝে গুমরে গুমরে মর্‌ছিল তাকে একান্ত নিছক-রূপে সত্যের আলোতে ফুটিয়া তুলেছে আমাদের এই সাহিত্য—এবং বাইরের থেকে তার ভিতরের আগুনের ইন্ধন যুগিয়েছে—বাংলা দেশের আবহাওয়া এবং ঠাকুর পরিবারের ছয় রকম বাধা ও ছত্রিশ রকম নিষেধের বন্ধন গুলি। সৃষ্টি-মাঝে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানবের নেহাৎ সৃষ্টিছাড়া নিরীহ হাবভাব, জুজুর ভয়, ভূতের ভয় প্রভৃতি হরেক রকম কাল্পনিক ভয়ের বীভৎসতা, মৃত্যুর ওপারের অজানা দেশটা সম্বন্ধে হরেক রকমের ধ্যান-ধারণা, ভূত-প্রেত সম্বন্ধে ঠা'কুমাদের বিচিত্র কল্পনা বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে কতটুকু দাগ কেটেছিল তা নিছক স্বরূপ ফুটে উঠেছে যৌবনে তার কলমের মুখে—গল্পগুচ্ছের ছোট ছোট গল্পগুলিতে।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে অনেকে অনেক রকম রসের অবতারণা করেন কিন্তু ছেলেবেলা যখন গল্পগুচ্ছ পড়ি তখন হাস্যরসের অন্তরালে আর একটী রস আমার মনের মাঝে উঁকি ঝুকি মারত—সে হয়েছে বিস্ময় রস। কোন্ কোন্ গল্প তখন পড়েছি তা মনে নেই কিন্তু এই বিস্ময় রসের প্রকোপে মনের মধ্যে কত হরেক রকমের ছবি গ'ড়ে উঠে কত অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুল্‌তে সাহায্য করেছিল—সে সব খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি নানা গল্পের কাঠামো হাত সরে এসে স্বতন্ত্র চিত্রশালার মত এখনো মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। এই বিস্ময়-রসের অন্তরালে কোন কোন গল্পে কুড়িয়ে পেতুম বীভৎস রস। ভৌতিক বিস্ময়ের ভীতিতে বুকের রক্ত যতই জমতে থাকৃত ততই সেই রহস্যময় অন্ধকাররাজ্যের ভিতর উঁকি ঝুকি

মেরে সন্ধান করবার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে চল্‌ত—ছবিগুলি আরো দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বস্‌ত।

মনে পড়ে "জীবিত না মৃত"এর কাদম্বিনীর সেই ছবি। ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী রজনীতে শ্মশানের বীভৎসতার মধ্যে, ভূতপ্রেতের আনাগোনার মাঝে কাদম্বিনীর অবস্থাটা ভাবিতে আমার শিশুমনটী আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠ্‌ত। রাত্রে এঘর হতে ওঘরে যাবার সময় সেই চিত্রটী আমার মনের মাঝে ঝল্‌কা মেরে আমাকে এমন ভীতিবিহ্বল করে ফেলত যে আমি যেন মানসনেত্রে অন্ধকারে জোনাকীর আলোতে ভূত প্রেতের আনাগোনা দেখ্‌তে পেতুম; সুতরাং একাকী অন্ধকারে চলাফেরা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। কোথা হতে নাজানি "শ্রীকান্তের" শ্মশানের ছবিটা ও ঠিক এসময় যুগপৎ মনের মাঝে ভেসে উঠ্‌ত। ভয়ে আমার বুকের রক্ত বরফ হয়ে যাবার যোগাড় হত। ঘরের মাঝেই যেন শ্মশানের বীভৎসতা দেখ্‌তে পেতুম।

এ হেন শ্মশানের বীভৎসতার মাঝে কাদম্বিনী জেগে উঠে দেখল সে আপনার ঘরেয় নাই, রোগশয্যার কথা মনে করে সে বুঝ্‌তে পার্‌ল সে বেঁচেই আছে। তা' কাদম্বিনী কেমন করে জান্‌ল বা বুঝ্‌তে পার্‌ল যে সে মরেনি,—এ ভাবনা আমার শিশু মনকে মহা সমস্যায় ফেলেছিল। মৃত্যু যে কি জিনিষ তা বোঝা একেত দুরূহ তা'তে আবার মানুষ ম'রে যে কেমন করে আপনার মৃত্যুর সত্যতা উপলব্ধি কর্‌তে পারে তা'কিছুতেই আমার মাথায় ঢুক্‌ছিল না। তাই কাদম্বিনীর মত আমার মনও সংশয় দোলায় দুল্‌ত। শেষে কাদম্বিনী পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরে প্রমাণ কর্‌ল যে সে প্রথমবার মরে নি। বাইরের লোক বুঝ্‌ল বটে যে কাদম্বিনী প্রথমবার ম'রেছিল না কিন্তু কাদম্বিনী নিজে কি ক'রে বুঝ্‌ল, সেইটাই রয়ে গেল আমার কাছে পরম সমস্যা।

মৃত্যু জিনিষটা খুব আশ্চর্য্য, খুব ভয়ঙ্কর হলেও তা' খুব অভ্রান্তভাবে খুব নিছক্ ভাবে সত্য। মৃত্যুর পরে লোক ভূত প্রেত হয় এবং ইচ্ছামত যেখানে সেখানে নির্ভয়ে ভ্রমণ কর্‌তে পারে সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষ একটা নূতন বলে বলীয়ান্ হয়ে ইচ্ছামত চলাফেরা কর্‌তে পারে। এই যদি হয় তবে মৃত্যুটা এত ভয়ঙ্কর কেন এবং ভূত প্রেত হওয়াটাই বা এত বীভৎস কেন এ আমার কাছে ভারী বিসদৃশ ঠেক্‌ত। মৃত্যুটা একটা পরিবর্ত্তন, খুব বিশ্রী; খুব অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সন্দেহ নাই। বিশ্রী ভাবতুম এজন্য যে এক মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষ স্নেহ দয়া মায়া সব বিসর্জ্জন দেয়; তা' না হলে "নিশীথে" নিরীহ দক্ষিণারঞ্জনের উপর এ অত্যাচার কেন? এক মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের ফলে সে মানবোচিত সমস্ত সহানুভূতির সীমা এড়িয়ে বেচারা দক্ষিণার মশারির পাশে শীর্ণ আঙ্গুল বাড়িয়ে "ওকে ওকে গো" বলে তীব্রভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত্রে মায়ের

বুকে শুয়ে দক্ষিণার মত আমি ও যেন মশারির চারিধারে কাহার আনাগোনা শুন্‌তে পেতুম এবং ভয়ে মায়ের বুকে আরও নিবিড়ভাবে আশ্রয় নিতুম। কিন্তু আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌তনা কারণ ভূতেরাও এক সময় মানুষ ছিল তো তারা কেমন করে এত নির্ম্মম হতে পারে।

মৃত্যুটা ধ্রুব সত্য কিন্তু মর্‌তে মানুষ চায় না। এর কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে এত অনুসন্ধান করেও মানুষ এ যাবত কোন সমাধানের মুখে আস্‌তে পারে নি'। এত গুলি চিন্তা; ভরসা সুখ দুঃখ আশা-নৈরাশ্য-বুদ্ধি-বিবেচনাতে বোঝাই করা মানুষের মানস তরীটী মৃত্যু সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেলেও যে কিরূপে ত'ার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হ'তে পারে তা' মানুষের মস্তিষ্কে ঢোকে না এবং এই মনটার বিনাশ মানুষ পছন্দ করে না সুতরাং মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ মানুষ স্বীকার করেনা বা কর্‌তে চায় না। জীবনে মানুষ ধন, জন, যৌবন, হিংসা, প্রেম প্রভৃতি অনেক জটীল জালে জড়ায়। এই পার্থিব জটিল জালই তার কাছে শাশ্বত হয়ে উঠে। সে জানে এই জাল ছিন্ন ক'রে সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে তাকে অনন্তের যাত্রী হ'তে হবে। সমস্ত জীবন দিয়ে তিল তিল করে মানুষ যা' গড়্‌ল যা'বেষ্টন করে আঁকড়িয়ে ধরে সে প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত বাঁচল তা ফেলে সে কোথায় যায়? যদি যায় তবে কি অতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সে অভীষ্ঠ বস্তুর পাছে ঘুরে বেড়ায় না বা তা পেতে চায় না? অজানা পরলোকে কেমন করে সে শান্তিপায়। মৃত্যুর সঙ্গে সবই কি নিঃশেষে মিলিয়ে যায় অনেক দিন যাবত এ ভাবনা ও জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জেগেছে সুতরাং আত্মার বিনাশ মানুষ স্বীকার করেনা। তাই বোধ হয়—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আত্মা অবিনশ্বর"—আমাদের বিজ্ঞান ও ঠিক এই কথাই অন্য ছন্দে বলে "পদার্থের বিনাশ নাই" (matter is indestructible)। আত্মার অবিনশ্বরত্বের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অনেক যুক্তি থাক্‌তে পারে কিন্তু ছেলেবেলায় প্রথম যখন গীতা পড়ি তখন আমি অবিনশ্বরত্বের এই রকম অর্থই করেছিলুম মনে পড়ে। জীবিত মানুষের এই দেহে কি পরদেহে বেঁচে থাক্‌বার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা'রই সহিত আপনার ও পরের মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহল ও বিস্ময় মিলিয়ে যে ভৌতিক বিস্ময়রসের স্থষ্টি হয়েছে মানুষ চিরকাল নানা কাহিনীর ভিতর দিয়ে নানা ছন্দে তাই প্রকাশ করে আস্‌ছে। প্রাচীনকালে তাই ছিল নিছক্ ভূতের গল্প। তার ভিতর বর্ণ ভঙ্গিমা বা রেখাবিন্যাসের বালাই মোটেই ছিল না। তার ভিতর শুধু ছিল একটা বিস্ময়কর বিভীষিকাময় রহস্যলোকের ছবি। মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস, ভয়, বিস্ময়, সংস্কার প্রভৃতির বিশ্লেষণ মোটেই ছিল না। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের চিন্তা শক্তির, ভাব্‌বার ক্ষমতা এবং স্বকীয় চিন্তা ও অনুভূতির ধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এবং সাহিত্য বস্তুর ছাঁচটীর, কারিগরি মাপজোখ এবং গল্পের

কাঠামোর ভিতর এনে তার নিয়ম কানুন মেনে চল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ভূতের গল্পের চেহারা বিল্‌কুল বদ্‌লে গেছে। বিস্ময়কর পরলোকের কাহিনীকে মানুষ শুধু ভীতি ও বিস্ময়ের গণ্ডীর মাঝে বন্দী করে রাখেনি'। তাকে অবলম্বন করে মানুষ আপনার কৌতূহল, সংশয়, বেদনা, অতৃপ্তি, ক্ষোভ বিস্ময়, জিজ্ঞাসা—সকল কিছুই প্রকাশ করছে; এবং বিচার বুদ্ধিও অধ্যাত্মবুদ্ধিকে স্বকীয় বিবেকের লাগামে টেনে এনেছে আবার সকল গুলিকে মিলিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির একটা সমগ্র রূপ ও প্রকাশ করছে। 'ঠানদি'র' কাছে শোনা ভূতের গল্প হ'তে রবীন্দ্রনাথের ভূতের গল্পের এই প্রভেদ। ছোটকালে ঠাক্‌মার কাছে গল্প শুনেছি রাত্রে না জানি কা'রা এসে লোককে ঘুম থেকে ডে'কে নিয়ে যায় এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে বিল ঝিলের মধ্যে নিয়ে মেরে ফেলে। ঠিক এইরকম ঘটনাই আমরা "মনিহারা"য় ফণিভূষনের সলিল-সমাধির মধ্যে পাই কিন্তু লেখক ঠিক এই ভাবে কথাটীকে প্রকাশ কর্‌তে চাইলেন না তা'ই লিখ্‌লেন জলে ডোব্‌বার আগে ফণিভূষণের তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। আবার পাছে এই ভৌতিক রহস্যটী পাঠকের কাছে সত্য বলে ভ্রম হয় তাই গল্পটীকে রহস্যের চরমসীমায় উন্নতী করে তাকে পরিহাসের ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। ভৌতিক জগতের বিষয় অনুসন্ধান করে তিনি কোন সমাধানে এসে পৌঁছুতে পারেন নি' তাই তার গল্পের মধ্যে যেখানে সেখানে তার লেখনীর মুখে সংশয় ও অবিশ্বাসের সুর বেজেছে কিন্তু সে সুর কোথাও বেসুরে বেতালা হয়নি যা'তে গল্পের ছন্দপতন হতে পারে। হাস্য, বিস্ময়, বীভৎস, সংশয় প্রভৃতি বিভিন্ন রসের আবর্ত্তনে পড়ে, নিছক ভূতের গল্প ও বেশ রসাল ও সুন্দর হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইহাই বিশেষত্ব।

"মনিহারা"র পোড়া অভিশাপগ্রস্ত বাড়ীটীতে পা দিলেই পাঠকের মন রহস্যময় কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে। তার পর আমাদের চিরপরিচিত সংসারে আনাগোনা—নায়কটী নব্যরঙ্গ—নায়িকা সুন্দরী, অলঙ্কারপিপাসু, সুগৃহিণী। মাণিমালিকা সাড়ী পরে, পাতা কাটে, বাজুবন্ধ পরে ঝুম্‌ ঝুম্‌ করে মল বাজিয়ে রান্নাঘরে রাজত্ব করে, ব্যঞ্জনে নুণ ঠিক দেয়—তাকে নিয়ে যে গল্প রচিত হবে তাতে স্বামীস্ত্রীর পারিবারিক সুখদুঃখের কাহিনী ভিন্ন আর কি থাকৃতে পারে; সেই ছন্দেই গল্প চল্‌ছিল বেশ—হঠাৎ সুর বদ্‌লে গেল। গহনা লুকোবার তাড়ায় মণি বাপের বাড়ী পালা'লে শূন্যগৃহে ফণিভূষণ যখন ফিরে এল তখন হঠাৎ পোড়ো অভিশাপগ্রস্ত বাড়ীটার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফু'টে উঠ্‌ল। গভীর তামসী রাত্রি, রন্ধ্রহীন অন্ধকারে শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণের মাঝে নির্জ্জন গৃহে ফণি বসিয়া—হরেক রকমের চিন্তা তার মাথার মাঝে কিল্‌বিল্‌ কচ্ছে; তার পর বর্ষার অন্ধকারে রাতের পর রাত নদীর ঘাট হ'তে সুর করে

দেউড়ী ডিঙ্গিয়ে, অন্তঃপুরের গোল সিড়ি ঘুরে, কঙ্কালময়ী সালঙ্কারা মনিমালিকার আসা যাওয়া—গভীর ভৌতিক রহস্যপূর্ণ, পড়তে গা'ছম্ ছম্ করে, বুকের রক্ত বরফ্ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়। ক্রমে রহস্য গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে চল্‌ল—ভৌতিক বিস্ময় উগ্র হ'তে উগ্রতর হয়ে উঠ্‌ল—অম্‌নি লেখকের লেখনীর মুখে সংশয়ের সুর বে'জে উঠল। স্বপ্ন যা ছিল তা সত্যের মুখোস প'রে উঠে দাঁড়াল আবার সত্য স্বপ্নের খোলস্ পরে মস্তিষ্কের কিলিবিলির অন্তরালে গা'ঢাকা দিল। স্বপ্ন সত্য কি জাগরণ সত্য ফণিভূষণের কাছে তা'ই হল ভাব্‌বার বিষয়। স্বপ্ন জার্গরণেব এই আবর্ত্তনের মাঝে ফণিভূষণের নিশীথের অভিসার সুরু হল। কঙ্কালের পিছু পিছু দেউড়ী ডিঙ্গিয়ে নদীর ঘাটে এসে ফণি জলে নাম্‌ল, পরক্ষণেই তার সলিল-সমাধি হ'ল। কঙ্কালময়ী মণিমালিকার এ ডাক্‌কে যখন নিবিড়তম রহস্য, বিস্ময় ও ভীতির মুখোস্ পরিয়ে পাঠকের সাম্‌নে ধরা হয়েছে তা'পাছে পাঠকের কাছে সত্য বলে মনে হয় তা'ই লেখক ফণির সলিল-সমাধির পূর্ব্বক্ষণেই বল্‌লেন "ফণিভূষণের তন্দ্রা টুটিয়া গেল...স্বপ্নের মধ্য হইতে মুহূর্ত্ত-মাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণেই অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল" পাছে রসভঙ্গ হয় এজন্য আগে একথা বলেননি' এবং শেষে ও বেশী জোর দেন নি' কিন্তু এই স্বপ্নলীলা এতখানি ভয়ঙ্কর করতে তাঁর প্রাণে বড় লাগ্‌ল তাই তার ভয়ঙ্কর রূপটি দেখিয়ে পুরোপুরী আনন্দ পাবার পর হঠাৎ সদয় হয়ে তিনি গল্পটাকে পরিহাসের ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। এতক্ষণ যে গল্প শুন্‌তে বসে, বসে বসে ঝিমু'চ্ছিল সে হঠাৎ বলে উঠল "আমার নাম ফণিভূষণ আমার স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী"। গল্পের কাঠামোর ভিতর কোথাও ঘা' লাগ্‌ল না, কারণ তা যতখানি মনস্তত্ব চর্চ্চা কর্ব্বার ও ভয় বিস্ময় ভীতি জাগিয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি আন্‌বার তা'এনেছে। লেখকের গল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, তার পরেই পাঠকের বুকের বোঝাটা হাল্‌কা কর্ব্বার জন্য সহাস্যে বল্লেন "এ হচ্ছে একটা আগাগোড়া পরিহাস"—এ যেন গাছের গোড়া কেটে প্রাণপণ করে আগায় জল ঢালা। মনের ঝাল মিটিয়ে গাল দেওয়া ও হ'ল আবার মানহানির মোকর্দ্দমার হাত হ'তে ও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কি মজা!

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটীতে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়রসকে গল্পের কাঠামোর গণ্ডীর ভিতর বন্দী করতে প্রয়াস পান্‌নি। গল্পটী পড়ে মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে যে কী ঔৎসুক্য ও কৌতুহল জেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে। যার মুখ দিয়ে লেখক গল্পটি বলাচ্ছিলেন সেই লোকটী কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করে হঠাৎ একটা ষ্টেশনে নেমে যাওয়ায় অনতি-যৌবনক্রান্ত রসপিপাসু পাঠকের মন লেখকের প্রতি মোটেই প্রসন্ন হয় নি'। বিস্ময় রসের প্রাচুর্য্য ও ইহাতে খুবই। বিস্ময়ের চরম সোপানে পাঠককে তুলে দিয়ে লেখক ট্রেণে চড়ে পিঠ্‌টান দিলেন, কেবল মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ছিল তাই যাবার বেলা বলে গেলেন "লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল———গল্পটা আগাগোড়া বানান।" গল্পটী

পড়ে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলের আবর্ত্তনে পড়ে মনটা হাঁফিয়ে উঠেছিল। গল্পটী পড়ে শেষ করেছিলুম অনেক রাত্রে। সে রাত্রে ঘুম হয়ে থাক্‌লে কখন হয়েছিল মনে নেই।

গল্পগুচ্ছের নানা গল্পে নানারকম রস নানারকম ভঙ্গী নিয়ে দেখা দিয়েছে। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর বিপদসঙ্কুলপথে মানবহৃদয়ের বহু বিচিত্রগতিকে, বহু চিন্তা, সমস্যা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিভিন্ন স্তরকে তিনি তাহার রচনায় সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার গল্পের ভিতর এমন একটা সৌন্দর্য্য, সুষমা ও সামঞ্জস্য আছে যা'তে সেগুলি আর্টের সৌকুমার্য্যে সরস ও সুন্দর হয়ে সাহিত্যের আখ্‌ড়ায় পুজারীদিগের নিকট সমুচিত আদর পেয়ে আস্‌ছে। সাহিত্যের ছয় রকম নিয়ম ও ছত্রিশ রকম নিষেধের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে গল্পগুলি স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্র ভাবে, নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। গোময়ের ভিতর হতে জন্ম নিয়েও পুষ্প যেমন করে আকাশের পানে তাকায়, তাহার গল্প গুলি ও সেইরূপ নানা ভঙ্গী ও নানা ছন্দের ঘটনার তরফ্‌ হ'তে বেরিয়ে এসে আর্টের সৌকুমার্য্যে সুন্দর, সরস ও সুবিন্যস্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। পঙ্কে ও যেখানে যার জন্ম সেখানে সে পঙ্কজ হয়ে আকাশের পানেই তাকিয়েছে; কারণ আর্ট মাটি নয় মাটিতে গড়া স্রষ্টার হাতের প্রতিমা। আর্ট রঙ নয় রঙের সংমিশ্রনে জাত তুলির আঁচড়ে আঁকা ছবি, সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্য সুসঙ্গতি ও সুবিন্যাসেই আর্টের জীবন, সুতরাং আর্ট সুন্দর, সুকুমার সুসঙ্গত, এবং নির্ম্মল।

শ্রীবীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাটির টান।

[এক]

নিদাঘ-মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণরশ্মি মস্তকে ধারণ করিয়া রহ্‌মান জমিদারবাড়ী হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল তাহার একমাত্র নবম বর্ষীয়া কন্যা আশ্‌মানী তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন দাওয়ায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অপ্রশস্ত আঙ্গিনার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কন্যার মুখপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই রহ্‌মানের দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, নিমেষে তাহার দৃষ্টিশক্তি অশ্রুধারায় রুদ্ধ হইয়া গেল, বৃদ্ধ মলিন বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া লইল। সমস্ত দিনের অনাহার, তদুপরি এই গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যতাপ সহ্য করিয়া করিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত বাড়ীখানা যেন তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—হঠাৎ সে ধড়াস্ করিয়া আঙ্গিনার মাঝখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ঘনীভূত নৈদাঘ নীরবতা রহমানের ক্ষুদ্র জীর্ণ হতশ্রী গৃহখানাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, আর তাহাই ভেদ করিয়া বাঁশঝোপের শীর্ষ হইতে ঝিল্লীদলের কর্কশ স্বরমূর্চ্ছনা উত্থিত হইয়া তাহার বিভীষিকা আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। রহ্‌মান প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল 'আশ্‌মানী!' তাহার কণ্ঠস্বর কণ্ঠেই লয় প্রাপ্ত হইল — গভীর নিদ্রাভিভূতা বালিকার কর্ণে তাহা প্রবিষ্ট হইল না।

রহ্‌মান উঠিয়া দাঁড়াইবার আরএকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাকিল,—'আশ্‌মানী!' পিতার কণ্ঠস্বরে কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল,—'কখন এ'লে বাবা! নেয়ে এস, তোমার ভাত বেড়ে রেখেছি।'

'আমি আজ খাব না।'

আশ্‌মানী সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেন খাবে না বাবা?'

'আমার ক্ষিদে নেই।'—কন্যার নিকট এত বড় একটা অসত্য উচ্চারণ করিয়া রহমান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। আশ্‌মানী কোনও উত্তর দিতে পারিল না, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পিতার আতপ-তপ্ত মলিন মুখের দিকে একদৃষ্টে কতক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'অমন কর্‌ছ কেন বাবা! কি হয়েছে বল না—জমিদার বাড়ী থেকে কেন ডাক্‌তে এসেছিল?'

রহ্‌মান এই সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না, একদৃষ্টে মৃত্তিকার পানে চাহিয়া রহিল। আশ্‌মানী ভীত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন কর্‌ছ কেন বাবা? কাল সমস্ত দিন উপোস করেছ, আজও এতটা বেলা হ'ল কিছুই খাওনি, তবু বল্‌ছ তোমার ক্ষিদে নেই!'

রহ্‌মান কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া আশ্‌মানী ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার দুই হাত আপন হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,— 'যাও বাবা নেয়ে এস, চারটে খাবে'খন।' জননীর মৃত্যুর পর তিনটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দরিদ্র পিতার সুখ দুঃখের সমব্যথী আশ্‌মানী এমনি ভাবেই পিতাকে সেবা করিয়া আসিতেছে, সমস্ত যাতনা ক্লেশ রহ্‌মান সংসারে একমাত্র কন্যার মুখ দেখিয়াই সহ্য করিয়াছে। আশ্‌মানীর আব্দার উপেক্ষা করিবার মত শক্তি রহ্‌মানের যে একেবারেই নাই অন্ততঃ সে জ্ঞানটুকু লইয়াই সে পিতার হাত চাপিয়া ধরিতে সাহসী হইয়াছিল। রহ্‌মান জোর করিয়া কন্যার হাত হইতে আপনার হাত ছিনাইয়া লইল। আশ্‌মানী ধাক্কা খাইয়া পিছাইয়া গেল, পিতার মনোভাবের আকস্মিক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অদূরে নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

[দুই]

অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের বিমল-স্নিগ্ধোজ্জ্বল-কিরণমালার মধ্যবর্ত্তী সুনির্ম্মল শশধর অমল জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া রহ্‌মানের জীর্ণ কুটীরখানাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। একটী শতচ্ছিন্ন মাদুরের উপর পিতা তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন কন্যাকে লইয়া নিদ্রা যাইতেছে। শিয়রস্থিত মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-রেখা কুটীরখানাকে আলোকিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রম করিয়াছে। নিশাচর পাখীর কর্কশ স্বরে সহসা রহ্‌মান জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিল ও নিষ্পলক নয়নে নিদ্রিত কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ভগ্নগৃহের এক অংশের মধ্য দিয়া একখণ্ড চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সহসা রহ্‌মানের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল; চক্ষু মুছিয়া গৃহাভ্যন্তরে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সে অপ্রশস্ত আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। রহ্‌মান দেখিল ঊর্দ্ধে অসংখ্য হীরক-খচিত প্রকৃতির বিচিত্রিত বসনাঞ্চল, আর প্রেমিক শশাঙ্কের অমিয় হাস্য-প্রস্রবণ। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল সদ্যজ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির রজত-সুষমা, যাহার লোভে সে প্রত্যহই এই আঙ্গিনায় বেতের মোড়ার উপরে বসিয়া গুড়্‌গুড়ি টানিত। জমিদারের হুকুম হইয়াছে,—আজই তাহার গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ পরদিনই তাহাকে গেরেপ্তারী দেওয়া হইবে; কারণ সে গরীব এবং তাই কয়েক বৎসরের খাজানা দিতে পারে নাই। তাহার পিতা পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত এই গ্রামের কোলে মানুষ। কতদিন রহ্‌মান সবুজ ঘাসের ক্ষেতে গরু চড়াইতে গিয়া ওই বাব্‌লা তলার শীতল ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—দিশেহারার মত সে ইহাই ভাবিতে লাগিল। এই নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিকের কদম গাছটার ডাল হইতে একটা পেঁচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শুনিয়া রহ্‌মান চমকিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত কন্যার মাথায় হাত দিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'আশ্‌মানী!' আশ্‌মানী নড়িল; দেখিয়া

রহ্‌মান সহসা দুই পদ পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ভাবিল, তাহাকে কি করিয়া এই নিদারুণ সংবাদ দিবে। অতীতের বেদনাময় জীবনের সমস্ত ইতিহাসটা তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

আশ্‌মানী সেইদিনই রহ্‌মানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কবে তাহার চারা আম গাছটায় মুকুল ধরিবে! তাহার সযত্নরোপিত তরকারী বাগান কেমন করিয়া আশ্‌মানী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে! তাহার সুখদুঃখময় ছোট্ট সংসারটিকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সে নিরাশ্রয়ে কোন্‌ ঠিকানায় বাহির হইয়া যাইবে? ভাবিতে ভাবিতে রহ্‌মানের চোখের জল ঝরিতে লাগিল। কিন্তু আজ রাত্রিতেই তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে; জমিদারের হুকুম—না মানিলে রক্ষা নাই।

রহমান আপনার মায়া কাটাইতে পারিলেও পারিত কিন্তু কন্যার কথা ভাবিয়া সে আকুল হইল। এই ক্ষুদ্র বাস্তুভিটার সহিত তাহার অপেক্ষা বালিকা কন্যার অন্তরের টান বেশী বলিয়া আজ তাহার বোধ হইল। রহ্‌মান ব্যথাভরা বুকখানা লইয়া আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল যেন আকাশ সহস্রচক্ষে তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

শর্‌শর্‌ করিয়া একটা উন্মাদ দখিণ হাওয়া বাব্‌লাগাছের শাখা দুলাইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া গেল।

[তিন]

'আশ্‌মানী! একটা কথা বল্‌ব, রাখ্‌বি তো?'

'কি কথা বাবা?'

'রাখ্‌বি কি না আগে তাই বল্‌না, না রাখ্‌লে বল্‌বনা।'

'রাখ্‌বার হ'লে নিশ্চয়ই রাখ্‌ব বাবা, কোনও দিন কি অবাধ্য হ'তে দেখেছ?'

'হাঁ রাখ্‌বার হ'লে......' রহ্‌মান চমকিয়া উঠিল, কথাটা তাহার নিকট রাখবার মত কি না তাই ভাবিতে লাগিল।

'কি, চুপ করে রইলে যে? বল না?'

'বল্‌ছি।...আজ এখনি আমাদের এ'বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, জমিদারের হুকুম, বুঝেছিস্‌? নইলে......'

জমিদারের আদেশ পালন না করিলে যে কি হয় তাহা তাহার অবিদিত ছিল না, তাই সে বাধা দিয়া বলিল,—'কোথায় যাবে বাবা?'

'রামপুরে চট্‌কলে কাজ কর্‌তে যাব। এখুনি রওয়ানা হ'তে হবে, অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে আমাদের রামপুরের পথে পড়্‌তে হবে।'

সবিস্ময়ে আশ্‌মানী কহিল,—'এখুনি ?'

রহ্‌মান দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল,-'হাঁ, এখুনি।'

'এখানে আর আমরা আস্‌বনা বাবা ?'

'না—আর আস্‌তে হবেনা।'

'এ' বাড়ী কা'র তবে, বাবা ?'

'যে যখন বাস করে তার।'

'আমরা এতদিন এ ভিটেয় রইলুম......... ।'

'আরে বোকা মেয়ে, এতদিন গায়ে জোর ছিল, জমিদারের কাজে লাগ্‌তাম ; এখন বুড়ো হ'য়েছি, দুটো পয়সা উপায় কত্তে পারিনে, আমার দ্বারা তাঁর আর কাজতো হয়না আর হ'বার আশাও নেই।'

'এযে ঘোর অবিচার বাবা !'

হাঁ, মা, দুর্ব্বলের এমনি করেই অবিচার অত্যোচার সইতে হয়,—এ যে সংসারেরই রীতি।

'তবে বাবা এ গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই আজ হ'তে উঠে গেল ?'

রহ্‌মান নিরুত্তর, তাহার অন্তরের প্রতি পরতে পরতে যেন এই কথার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

আশ্‌মানী মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা !'

একবিন্দু তপ্ত অশ্রু রহ্‌মানের শিথিল গণ্ডদেশ বাহিয়া নীরবে মৃত্তিকা চুম্বন করিল। কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

আশ্‌মানী পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'বাবা, চল—এখনি চল ; যে দেশে এমন অত্যাচার সে দেশে থেকে দরকার কি বাবা ?'

এমন একটী ছোট্ট মেয়েও যখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে দেশে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অমন কঠোর অত্যাচার সে দেশে বাস করা অনুচিত তখন রহ্‌মানের আর দুঃখ করিবার কিছুই রহিল না। সে আকুল প্রাণে কন্যাকে তাহার রোগজীর্ণ বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'মা, চল্ মা, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই সঙ্গে থাক্‌তে আমার দুঃখ কি ?'

একটা কোকিল বাব্‌লাগাছের ডালে বসিয়া যামিনীর গভীর নীরবতা ভগ্ন করিয়া দিয়া গেল।

[চার]

শীতের প্রবল প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আকাশে কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র অনুজ্জ্বল কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিয়া ধরিত্রীর শতধা-বিভক্ত বিশুষ্ক বক্ষ আলোকিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

রামপুরের এক বস্তির ভিতর একটী মাটির দেওয়ালঘেরা জীর্ণ গৃহে রুগ্ন রহ্‌মান সেবারতা কন্যাকে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'রাত কত আছে, মা ?'

'রাত বেশী নেই, তুমি ঘুমোও বাবা।'

রহ্‌মান কতক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, 'আমি সত্যি বল্‌ছি মা, বাড়ী গেলে আমার রোগ সেরে যাবে।

আশ্‌মানী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিল,'তুমি ভাল হয়ে নাও বাবা, একবার বাড়ী যাব, খন।' রহ্‌মান ভাবিল—'ভাল হবত ? আর যদি না হই, তবে এ জীবনে আর বাড়ী যাওয়া হ'লনা।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—বাড়ী ? তাহার বাড়ী কোথায় ? সেখানে তাহার কি আছে ? যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মনের এই চিন্তা দমন করিয়া রহ্‌মান কহিল,—'না, চল্‌ আশ্‌মানী, এক্ষুনি যেতে হবে, সেখানে না গেলে যে আমি ভাল হ'বনা !'

আশ্‌মানী বাধা দিয়া কহিল, 'ডাক্তার যে তোমায় ঠাণ্ডা লাগাতে নিষেধ করেছে, বাবা !' রহ্‌মান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—'বাড়ী যাব, ডাক্তার কে আবার ? আমার ছোট্ট ভিটে খানা যে আমায় তার দিকে টান্‌ছে !

আশ্‌মানী বুঝিল, পিতা প্রলাপ বকিতেছে, কিন্তু সে আপত্তি করিতে পারিল না।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রোগজীর্ণ রহ্‌মান কন্যার হাত ধরিয়া রহমপুরের পথে বাহির হইল, যখন গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই।

রহ্‌মান তাহার পরিচিত বাব্‌লা গাছটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—'দেখ্‌ছিস্‌ মা, ওই আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, চল্‌ একটু তাড়াতাড়ি চল্‌।'

আশ্‌মানী বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিল। রহ্‌মান বলিল,'কাঁদছিস্‌ কেন মা ? আজ যে আমাদের বাড়ী ফেরার দিন !'

রহ্‌মান বাব্‌লা তলায় গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। এইখানে যে সে গ্রীষ্মের দিনে বসিয়া সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠের শীতল হাওয়া কত দিন উপভোগ করিয়াছে। সহসা রহ্‌মান বলিল,—'এখানে একটু বসে নেই মা, বড় পরিশ্রম হ'য়েছে।'

রহ্‌মান বসিয়া ধীরে ধীরে ঘাসের উপর তাহার জীর্ণ দেহখানা এলাইয়া দিয়া সম্মুখের উষার প্রথম রক্তরাগে অনুরঞ্জিত তাহার চিরপরিচিত গৃহখানার দিকে নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। গভীর তৃপ্তিতে ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু দুইটি যেন নিদ্রাবেশে মুদ্রিত হইয়া আসিল, শিথিল শীর্ণদেহ স্নিগ্ধ তৃণ শয্যায় এলাইয়া পড়িল। পূর্ব্বদিগন্তের অরুণদ্যুতি তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ম্লান হাস্যবিভায় উদ্ভাসিত করিয়া দিল !

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

শক্তির বিকাশ।

ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র শক্তির খেলা চল্‌ছে, তার বিকাশ চিরদিন ধ'রে। সৃষ্টির গোড়া থেকেই এর সুরু—ঈস্‌রাফিলের প্রলয় সিঙ্গা বাজার পরেও এর আধিপত্য থাক্‌বে।

শক্তির বিকাশ এ জগৎটাই; একে চাপা দিতে কেউ পারে না—স্বয়ং বিধাতাও তার ব্যতিক্রম করেন না; কারণ এইটাই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। গোলাব যে দিন ফোটো ফোটো—মাধুর্য্য তার সেই দিন! তার আগে বা পরে তাকে সুন্দর কেউ বলে না—আদর করতে কেউ চায় না তেমন প্রাণ দিয়ে।

শক্তি নিয়েই জীব—শক্তি নিয়েই জগৎ; সংঘর্ষণ তাই অহরহঃ। আর এই সংঘর্ষণেই বিশ্বের অস্তিত্ব—সৃষ্টির মূলেও এই সংঘর্ষ।

শক্তি সাধনায় তাই জীব মাতিতে চায়, শক্তি তার প্রকাশ কর্ত্তে চায় বিশ্বের বুকে; বিশ্বের কাজে তাকে খাটা'তে চায়; বিশ্ব-সৌন্দর্য্য তার শক্তি সাধনারই অমর দান।

সমর্থই জগতে বাঁচে, দুর্ব্বল প্রতি পদে মরে—ব্যথার আঘাতে নুইয়ে পড়ে তার যথা-সর্ব্বস্ব। কিন্তু জীবকে বাঁচ্‌তে হবে,—বাঁচার জন্যই তার আসা। বাঁচ্‌তে হবে তাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যে; প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে তাকে অর্জ্জন কর্ত্তে হবে এক দুর্জ্জয় শক্তি। ওর ক্ষুদ্র শক্তির উপর নিজের জয়ী শক্তিটাকে আরো সবল—সফল ক'রে তুল্‌তে হবে; নইলে আর একটা সংঘর্ষ এসে তাকে চুরমার ক'রে ফেলতে পারে।

জগতে বাঁচা যেমন সত্য, তেমনি সত্য শক্তি অর্জ্জন করাও; দিনে দিনে গুটিশুটি চলে পতনকে দাবিয়ে চাই শক্তি অর্জ্জন। অদৃষ্টের লেখা ব'লে কিছু নাই—"অদৃষ্ট তো মানুষ নিজেই তৈরী করে।" নিজের হাতে না খেলে যেমন ক্ষুধা যায় না, তেমনি নিজের হাতে নইলে অদৃষ্ট গড়ে না। মানুষের নিজ কার্য্য আর আচার ব্যবহার সমষ্টিতেই তো চরিত্র গড়ে উ'ঠে; খোদা কারো চরিত্র নিজের হাতে গ'ড়ে দেন নি। অদৃষ্ট তো এই চরিত্রেরই গৌণ ফল। চরিত্রের দরকার কেন? মানুষ ব'লেই তো—বাঁচার জন্যেই তো? অবনতি যেখানে, সেখানে স্বভাব আর কর্ম্মধারার দৌর্ব্বল্য দোষ; সুখ দুঃখতো জীবের নিজেরই কর্ম্মফল। এখানে কর্ম্মই সব। নীরব নিশ্চেষ্ট বসে যে, তার উন্নতি তো খোদা নিজে এনে কোন দিনই দেননি—দেবেনও না। এই কর্ম্মকেই বল্‌তে চাই অদৃষ্ট। কর্ম্মই জীবন—কর্ম্মেই তার সমাপ্তি।

কর্ম্মই শক্তি সাধনা—শক্তি অর্জ্জন। উন্নতি আনে তো পরিশ্রমই। ঐখানেই আমাদের সাধনা—শক্তি-সন্ধান। চাই পরিশ্রম—চাই শক্তি। মানুষ আসে বাচাঁর জন্য—মরার জন্য নয়।

শক্তি একদিনে দুর্জ্জয় হয় না। পূর্ণ শক্তিতে বিকাশ পায় না — চাই বহুদিনের মরণপণ সাধনা — পতনের বার বার আঘাত; আঘাত নইলে যে ব্যথা জন্মে না, দুঃখ আসে না; বাধা দেওয়ার জন্য—প্রতিশোধের জন্য প্রবৃত্তি 'চেতন মানে না'। অপমান তাই চাই আমার সম্মান লাভের জন্য—মৃত্যু তাই চাই আমার বাঁচার জন্য। সাফল্য আসে বিফলতার ভিতর দিয়েই; ইচ্ছা-শক্তি যেখানে প্রবল নয়, সাফল্য সেখানে ধরা দেয় না — খোদার আশীষ সেখানে ঝরে না। চাই দুর্জ্জয় সাধনা।

অক্ষম এই ক্ষীন দেহ-যষ্টি শক্তির খেলায় মেতে উঠ্‌তে পার্‌বে না ব'লে তোমার ব'সে থাকা চল্‌বে না, ক্ষীন্ন তোমার প্রাণে তেমন বল জুট্‌বে না ব'লে অজুহাত দেখানো—সে হবে না; যোগার তোমার কর্ত্তেই হবে—একদিনে না হোক, দশদিনে না হোক—যুগান্তে তো সে শক্তি সঞ্চিত হবে। হয়তো ছুটে আস্‌তে চাইবে মরণ বাধা দিতে; ভীত হ'লে তা'তে চল্‌বে না; সাধনার তা ধর্ম্মই নয়।

শক্তি সাধনার প্রকার দুই—মানসিক বা আধ্যাত্মিক আর শারীরিক। মানুষের চাই এ দু'য়েরই সাধনা। মনের সাথে শরীরের সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ, তা'তে শুধু শরীরের দিকেই মনঃসংযোগ কর্ল্লে সাধনার পূর্ণতা আসে না; অথবা শুধু নিছক আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্ল্লে তাও যাবে বিফলে। একের অভাবে অন্যের টেঁকা দায়। দেহইতো মনের আবাস। শরীর যেখানে অস্বীকৃত—মনের অস্তিত্ব সেখানে অসম্ভব। বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ডিগ্রী অর্জ্জন করার জন্য দেহপাত ক'রে তারা বসে, স্বাস্থ্যের দিকে মন দেওয়া দরকার বোধ করে না; তাই দৃষ্টিশক্তি তারা হারিয়ে বসে, শরীর ধারণের মত শক্তিও তাদের থাকে না। একটা কিছু তারা হয় বটে, কিন্তু সে হওয়া কোন কাজের হওয়া নয়। যখন তাদের শরীরের দিকে একবার চোখ পড়ে—নিজে নিজেই তারা ঘৃণা বোধ করে।

শক্তি অর্জ্জনের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণটা মানসিক পরিশ্রমের অনুপাতে না হ'লে জড়তা আসা সেখানে সম্ভবপর — মনঃশক্তি নিস্তেজ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

বেঁচে থাক্‌তে হ'লে চাই আমার এ দু'য়েরই সাধনা। বাহুর শক্তিই শুধু বাঁচাবে না, তার সাথে চাই জ্ঞান আর বুদ্ধির যোগ। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তি বায়ুর সহায়তায়ই অতটা প্রবল হ'তে পারে। বায়ু সদা প্রবহমান না থাক্‌লে অগ্নির সে শক্তি হ'ত না—হলেও ততটা জোরের হ'ত না।

আজ এসেছে শক্তি সাধনার যুগ। এ যুগে নবীন তোমার অর্জ্জন কর্ত্তে হবে তোমার বাঁচার শক্তি—এক দুর্জ্জয় অক্ষয় শক্তি—বজ্রে যা টলবে না, পতনের আঘাতে যা ম্লান হবে না—ম'রে যাবে না।

সব কিছু তোমার নির্ভর কচ্ছে এ সাধনার উপর। এতে তোমার সাফল্য যতটুকু তোমার চলার পথে, উত্থানের পথে উন্নতি ততটুকুই। শক্তির বিকাশ যারা যতটুকু কর্ত্তে পেরেছে, বিশ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার তারা তত ঊর্দ্ধে উঠেছে। শক্তি যখন মূঢ় জীবন-জোড়া পতন তখন অবশ্যম্ভাবী।

আবদুস ছামাদ খাঁ।

উড়ো চিঠি।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

রামায়ণে একটা গল্প আছে—বোধ হয় জানেন, না জানার কোন নজির নাই, কারণ আপনারা সবজান্তা—সমুদ্র বন্ধনের সময় একটা ক্ষুদ্র কাঠ্‌বিড়ালী তা'র লেজুড় দিয়ে বালুকা উৎক্ষীপ্ত ক'রে সেতুর উপর দিচ্ছিল, ত'াদেখেঁ উপস্থিত সবাই হেসে উঠেছিল; তা'তে সে উত্তর দিয়েছিল,—"তোমরা সবাই বড় কাজ ক'রে বড় বাহবা নেবে, আর আমি ছোট কাজ ক'রেও কি একটা ছোট বাহবা নেব না?"

কাঠ্‌বিড়ালী বুনোজন্তু,—আর একেবারে সেকেলে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ হ'য়ে জন্ম নিলে সে তথাকথিত সভ্যসমাজ থেকে hooted out হ'ত; ডি, এল, রায়ের ভাষায় 'একঘরে' হ'য়ে থাকৃত। কারণ এখন সবাই বড় হ'তে চায়। ছোট কাজ ক'রে বড় মুনাফা সুদ সমেত আদায় করতে চায়। যাক্‌, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন?

আপনাদের তাড়না, বন্ধুবান্ধবের গঞ্জনা—আর, বল্‌তে কি,—প্রশংসা পাওয়ার বাসনা,—আমার 'কাঁচা আমি'কে পাগল ক'রে তুলেছে। Hostel Lord পাগ্‌লা গারদে না পাঠালেই বাঁচি।

আপনারা কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সংস্কার-রথের চাকা টান্‌তে লেগে গেছেন, কাজেই আপনাদের টানের চোটে অনেককেই রথের তলায় প'ড়ে—বিঘোর বিপাকে প'ড়ে—অপরিপক্ক (?) অবস্থায় চিত্রগুপ্তের কাছে হাজিরা দিতে হবে এটা আমি হলপ্‌ ক'রে না বল্‌তে পার্‌লেও অনুমান অথবা কল্পনা ক'রে নিতে পারি।

যাহোক্‌ তবুও নূতন কিছু গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌বেন আপনারা। বেশী কিছু লিখ্‌তে চাই না। একেইত প্রবন্ধের (না কবন্ধের?) জন্য লেখক-প্রভুদের বাড়ী বাড়ী হেটে পা অবশ হ'য়ে গেছে, তার উপর যদি উকীলের বাড়ী যাতায়াত করতে হয় তবে আপনাদের দশা কি ঘটবে তা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

ভাল ছেলেটির মত চুপ্‌টী ক'রে বসে—যদিও চুপ থাকার কথা আমার কোষ্ঠীতে নেই, তবুও আপনাদের খাতিরে (ভয়ে নিশ্চয়ই নয়)—প্রবন্ধ লিখ্‌তে বস্‌লুম। কিন্তু হায় রে, "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকিয়ে যায়।" ত্রেতাযুগে রত্নাকরকে দেখে সাগরের বুক শুকিয়ে গেছিল, আমার মত লেখক দেখে এই কলিযুগেও ভাবের নদীতে চড়া প'ড়ে গেল। এই চড়ার উপর বসে আকাশ পানে হা করে চেয়ে আছি, যদি আবার সে ফিরে এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কবিতা লিখ্‌তে বসেছিলুম। কিন্তু এক বন্ধুপ্রবর সুচনাতেই ব'লে ফেল্‌লেন,—"তুমি কবি হ'লে অমার ঘরের কোণের তেলেপোকাটীও দেখ্‌ছি পাখী হ'য়ে উঠ্‌বে।" সাধে কি আর মেকলে সাহেব বাঙ্গালীকে হিংসুটে ও মিথ্যাবাদী ব'লে গাল দিয়েছেন? মনের গুমর চেপে রেখে ভাব্‌তে লাগলুম। আকাশ পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে এক খেয়াল চাপ্‌ল—ছোটগল্প লিখ্‌ব। যেই ভাবা অম্‌নি ব'সে যাওয়া! শ্রীরামপুরী কাগজ; পি, এম্‌, বাগচীর কালী ও উজিরপুরী নিব (কারণ, দেশী গল্প লিখ্‌তে দেশী উপকরণ লাগে,—পণ্ডিতেরা বলেন) হুবহু খরচ করে 'হা' হতোস্মি'পূর্ণ এক গল্প লিখে এক সম্পাদক ভায়ার নিকট পাঠালুম। কয়েকদিন পরে সে বেটা (ভদ্রতার খাতিরে মধুর সম্পর্কে আপ্যায়িত কর্‌লুম না) এক দীর্ঘ সমালোচনা ও টিপ্পনী কেটে লিখ্‌লেন—"আপনার গল্পের 'ভাব' নিছক চোরাই বিধায় গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লুমনা।" হায়রে অভাগা দেশ, এ দেশে গুণীর গুণ কেউ বুঝতে পার্‌লেনা। পারবেই বা কোত্থেকে? 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

আচ্ছা বলুন ত চোর নয় কে? জুলিয়স্‌ সিজার, সেকেন্দর শাহ, বক্তিয়ার খিলিজি বা ক্লাইভ্‌ কোন্‌ সংজ্ঞায় পড়েন? চোর না সাধু? আচ্ছা বিচার করুন কে বড় চোর—যে আঁধারে চুরি করে সে? না যে দিনের আলোতে জগতে সবার সাম্‌নে অপরের বিত্ত হরণ করে সে? যে চুরির অপরাধে পরীক্ষাগৃহ হ'তে অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে ফিরে আসে সে? না যে অপরের নোট কণ্ঠস্থ বা ঠোঁঠস্থ ক'রে অপরের চিন্তাধারা হুবহু নকল ক'রে Ph. D. উপাধি পায় সে? চুরি কি নকলের Synonym নয়? অন্ততঃপক্ষে Secondary অর্থ ত? ধার ক'রে ধার স্বীকার না কর্‌লে নিছক চুরি করা হয়। কিন্তু একজনের জব আর একজনের জবের সঙ্গে মিলে গেলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় তার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই।

বাণীর বরপুত্র Shakespeare যখন স্বীয় অমানুষিক প্রতিভাদ্বারা সাহিত্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠ্‌লেন তখন কতকগুলো নিন্দুক জুট্‌ল। তারা বল্‌তে লাগ্‌ল,—Shakespeareএর নিজের কোন Originality নাই। তিনি অন্যের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেছেন মাত্র। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" ব'লে একটা কথা আছে। তাই Landor সাহেব গর্জ্জে উঠে বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লেন, "Yet he was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life."

Miller সাহেব এ কথাটা আরও ব্যাপকভাবে দেখিয়ে গেছেন তাঁর অমর মন্তব্য দিয়ে—"Poetry, drawing within its circle all that is glorious and inspiring, gave itself to but little concern as to where its flowers originally grew." স্বভাব-কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখনই নূতন কিছু শুন্‌তেন তখনই সেটাকে নিজের ক'রে নূতন প্রাণ দিয়ে, মহীয়সী ক'রে গ'ড়ে তু'লে সমাজের চোখের উপর ধর্‌তেন। De Quincey যদি বল্‌তেন,—"ওটা আমিই তোমাকে বলেছি,"—তখনই তিনি তাড়াতাড়ি বল্‌তেন,—"না হে না, ওটা আমারই। অন্যের ভাবের সঙ্গে নিজেকে assimilate ক'রে নিতে পার্‌লেই বাহাদুরী।" জ্ঞানের অবতার বেকন সাহেবের মত—"I take all knowledge to be 'my' province," এতে এই প্রমাণই হচ্ছে যে সত্যকার জিনিষটা কা'রও monopoly নয়। ওর উপরে আমার যে অধিকার আছে, পেঁচো বা প'দেমাসিরও সেই অধিকারই আছে। নকল বা অনুসরণ একই categoryতে পড়ে বটে, কিন্তু 'অনুকরণ' 'নকলের' সংজ্ঞা থেকে একটু উপরে। গুরুমশায় নিজ হাতে কলাপাতার উপর আখর এঁকে দেন, ছোট ছেলেরা তাকে মক্‌স করে। অনুকরণটাও একপ্রকার তাই। আদর্শ না থাক্‌লে পূর্ণতা কুব্জ হ'য়েই থাকৃত, সোজা হ'তে পার্‌তনা।

ঈশ্বরগুপ্ত না থাক্‌লে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার সমীচীন বিকাশ হ'তনা। বৈষ্ণব কবিতার ভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য হ'য়েছেন। ভারতের লুপ্ত গৌরবকে সঞ্জীবনী দ্বারা বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জবধারা নিয়েই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে, যদিও তাঁর ভাষা, তাঁর বল্‌বার ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। ভারতের মিল্টন হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা মহিলা কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

প্রতিভাশূন্য ব্যক্তি যদি নকল করে তবে ব্যাপার গুরুতর হ'য়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই। একে মন্দ তা'তে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্রই ঘৃণ্য নয়।" তিনি আরও বলেন, "অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নয়; কখন কখন তাতে অভাবনীয় সুফলও জন্মে। প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে।"

কিন্তু আমাদের মত লেখক হুবহু অনুকরণ (পরিষ্কার ভাষায় নকল) ক'রেও লজ্জিত হয় না। নিজের দোষের সাফাই গাহে। 'Right of conquest, যদি right হয়, তবে Right of theft একটা right হবেনা কেন?' এর উত্তর আপনারা দিতে পারেন কি?

ইতি—

শ্রী উনপঞ্চাশ শর্ম্মা।

সাঁঝাই।

সাঁঝ হলরে, সন্ধ্যা হল, ফুট্‌লো তারার দীপমালা!
ফুলবিলাসী দখিন্ হাওয়ায় দুলছে সাঁঝের ফুলদোলা।
চাঁদের চোখের চমক নিয়ে
জরদা চেলীর উত্তরীয়ে
আল্‌পনা ছায় আল্‌তো বাতাস সাঁঝাই স্বরে মনভোলা।

সবুজ ক্ষেতের আব্‌ছা আলোয় মত্ত বাতাস দোল্‌খেলে;
কোন্ গহনের স্বপ্নমোহে মল্লিকা চায় চোখ্ মেলে;
কনক চাঁপার শীর্ণ ঠোঁটে
ক্লান্ত দিনের হাস্য ফোটে
রঙ্‌বেরঙের পান্‌সী ওড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলে।

রঙ্‌গরবী সোণার মোহর কৃষ্ণচূড়ার ফাগ্‌রাগে
তীব্র মদির-গন্ধে হেনার সুপ্তি-শিথিল দিল্ জাগে।
বকুলবনে শিউরে পুলক,
গন্ধে মাতাল ভূলোক দ্যুলোক,
আধ-ফোটা ফুল-কলির ঠোঁটে চাঁদের আলোর চুম্‌লাগে।

পান্নাপাঁতির কণ্ঠমালায় সাজ্‌ল অশথ্ দেবদারু,
জোছ্‌না দলের ওড়্‌না-আড়ে বল্লীবালার বেশচারু;
চক্ষে হাসির বিজ্‌লী হেনে
অপ্‌সরা চায় আকাশ কোণে
নীল কাজলের কাজল লতায় সাজিয়ে তাদের যুগ্‌ভুরু।

ঝিল্লী-মুখর পল্লীবাটে ঘূর্ণী পথের মাঝখানে
স্তব্ধ বাতাস চম্‌কে ওঠে পল্লীবধূর কঙ্কনে,
কোন্ সে আকুল বাঁশীর সুরে
নিদ্‌হারা এ মর্ম্মপুরে
গোকুলবালা চম্‌কে ওঠে নবীন প্রাণের স্পন্দনে।

কল্পনা আজ উধাও হল হাল্‌কা পাখায় দিল্ খোলা
আনন্দেরি হিন্দোলে আজ দুলছে প্রাণের ফুলদোলা—
বর্ত্তমানের হর্ষে গানে,
অতীত দুখের বিসর্জ্জনে,
নবীন প্রাণের গানের তানে হর্ষে ভুবন হরবোলা।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে।

হালী।

আধুনিক উর্দ্দু-সাহিত্য যাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, শামসুল ওলামা মওলানা আল্‌তাফ হুসেন হালী সেই মনীষীদের সর্ব্বপ্রথম। প্রচলিত উর্দ্দু সাহিত্যকে সংস্কৃত করণোদ্দেশ্যে সাধনা-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ইহাকে যেই ভাব ও ভূষায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতে অনেক উচ্চতর আদর্শে তিনি ইহাকে সংগঠিত ও সঞ্জীবিত রাখিয়া যান। তিনি যে সকল অমর গদ্য গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন সে সকল যুগ-যুগান্ত-কাল উর্দ্দুর জ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্যসম্পদরূপে সুধীসমাজের কাছে গৃহীত হইবে। সাহিত্যিকের কষ্টি-পাথরে তিনি এক প্রতিভাবান্ কৃতী স্রষ্টারূপে দেদীপ্যমান; তাঁহার সৃষ্টি অনুবর্ত্তীকালের সাহিত্যচর্চ্চায় খ্যাতি-অন্বেষীদিগকে মহিমতর আদর্শ ও ভাব-প্রবণতায় অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে ও হইবে।

১৮৩৭ অব্দে পানিপথ সহরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দীর্ঘ ৭৭ বৎসর বয়সে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আল্‌তাফ হুসেন নিজ জন্মভূমিতে মরলীলা সংবরণ করেন। নবাব ইমাদুল মুল্‌কবিল-গ্রামীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি যে আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত বহু ইতিবৃত্ত দত্ত হইয়াছে। হালীর পূর্ব্বপুরুষ আন্‌সারীরা প্রায় সাত শতাব্দী যাবৎ পানিপথে অধিষ্ঠিত আছেন। এই বংশের আদিপুরুষ খাঁজামালাকআলি হেরাত হইতে গেয়াসুদ্দীন বল্‌বনের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তৎকালের সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন; সম্রাট বল্‌বন কাজেই পানিপথ পরগণায় কয়েক বিঘা উর্ব্বর জমি জায়গীর দিয়া তাঁহাকে তথাকার কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হালী পিতৃপক্ষে উক্ত মালাক্ আলির ও মাতৃপক্ষে এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের রক্ত-সম্ভূত।

আল্‌তাফ হুসেনের বাল্যজীবন নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে ভরপুর। তাঁহার জন্মের অত্যল্পকাল পরেই তদীয় জননী সামান্য প্রকৃতির ক্ষিপ্রতা-রোগে আক্রান্ত হয়েন, আর নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তাঁর পিতৃদেব দেহত্যাগ করেন। "হায়াতে-হালী"র খ্যাতনামা লেখক সৈয়দ মাহমুদ ফারুকের মতে হালীর পিতা উন্মাদ হইয়াছিলেন এবং মাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিবরণ সত্য নহে। সংসারে সবার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র ভ্রাতা-ভগ্নীকেই তিনি নিজের পোষকরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিবেদিত-প্রাণ আন্‌সরীকুলের পর-পুরুষ হিসাবে তিনি সর্ব্বাগ্রে মৌখিক কোরাণ পাঠে বাধ্য হয়েন, অতঃপর তিনি পার্শী ও আরবী ভাষা অধ্যয়নার্থে গমন করেন; কিন্তু কোন শিক্ষা-গৃহের নিয়মিত শিক্ষালাভের সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন না। পার্শীতে তাঁহার আদি-গুরু সৈয়দ জাফর আলি উক্ত ভাষায় তাঁহাকে

উত্তম রূপ শক্তিমান করেন। মৌলবী ইব্রাহিম হুসেন আন্‌ছারীর নিকটে তিনি আরবী অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, সবেমাত্র লক্ষ্ণৌ হইতে ধর্ম্মতত্ত্বে পণ্ডিত হইয়া তিনি তখন পানিপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহিত হইবার জন্য সংসারে বর্ত্তমান ভ্রাতাভগ্নীরদ্বারা তিনি নিতান্ত ভাবে অনুরুদ্ধ হয়েন। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতা ভগ্নীকেই হালী তুল্যরূপশ্রদ্ধা করিতেন, তাই অতি আগ্রহের লেখা পড়ার দ্বার রুদ্ধ হইবে জানিয়াও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে তিনি বিবাহে অগ্রসর হন।

তাঁহার স্ত্রীর পিতামাতার অবস্থা সচ্ছল ছিল। তাঁহারা কতক দিনের জন্য পত্নীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন জানিয়া হালী গৃহ-সংসার হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়েন; এবং দিল্লীতে দেড় বৎসর ধরিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রচারক মোহ্‌লবী নোয়াজিস্ আলির অধীনে অধ্যয়নে রত রহেন। পুরাতন দিল্লী-কলেজ তখন উন্নতির উচ্চতমশিখরে আরোহণ করিয়াছে, ভারত-বিখ্যাত মৌলবী নাজীর আহ্‌মদ ও মুন্‌শী জাকাউল্লাহ্‌ তথায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি কিন্তু সেই কলেজে ভর্ত্তি হইতে সাহসী হইলেন না, যেহেতু তিনি জানিতেন যে পানিপথে তাঁহার স্বজনেরা পাশ্চাত্যশিক্ষার বা ইংরেজী ভাষার যে কোনো প্রকার জ্ঞান লাভ সহ্য করিবার মত উদারমতাবলম্বী নহেন। তৎকালীন মুস্‌লিম্ ধর্ম্মশাস্ত্রাধীতিরা ইংরাজী বিদ্যাগার সমূহকে "মজহাল" নামে অভিহিত করিয়া—অতি হেয় চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। এইরূপে পাশ্চাত্য-জ্ঞান-সঞ্চয়ে বঞ্চিত হইয়া তিনি প্রাচ্যশিক্ষাতেই আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু সেই পথেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার অবস্থিতির সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলেন; ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হন। এই ঘটনায় অন্তরে তিনি নিতান্ত আঘাত পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাটী ফিরিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন না, নিজে নিজে বৎসরেক কালের মত জ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া লইলেন। কোনো চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আত্মীয়েরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া বসিলেন; "হীসারে" ১৮৫৬ অব্দে কলেক্টর-অফিসে কোনো প্রকারে তিনি একটা ভালো চাকুরী যোগাড় করিয়া লন, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের অভ্যুত্থানে তিনি তথায় বৎসরেকের অধিক কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না। পুনর্ব্বার পানিপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত শুধু জ্ঞানালোচন-ব্যতীত তিনি আর কোনো দ্বিতীয় কর্ম্ম করিবার পাইলেন না। যদিও তাঁহার জ্ঞান সঞ্চয়ের পথে নানা প্রতিকূল ঘটনা আসিয়া বারম্বার বিঘ্ন জন্মাইতেছিল, তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত্ত থাকিয়া যায় নাই; পার্শী ও আরবী ভাষায় তখনকার দিনে তিনি একজন অতি বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

পানিপথে অবস্থিতিকালীন তিনি পার্শী ও আরবীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন;

কারন তৎকালে কবিতা-লিখার সামর্থ্যকে একরূপ পূর্ণত্ব-হিসাবে মান্য করা হইত। দিল্লীতে যাতায়াত কালে প্রসিদ্ধ কবি "গালীবের" সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে তিনি নিজের অন্তরে সমাহিত কবি-সুলভ বিশিষ্ট গুণাবলীর সহিত পূর্ণ পরিচিত হইতে পারেন নাই। দিল্লীতে প্রথম অবস্থান-কালে তিনি গালীবের সংস্রবে আসেন; এবং প্রায়ই তাঁহার সাহচর্য্য সময়ে তাঁহাকে স্বরচিত কঠিন পার্শী ও উর্দ্দু কবিতা সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া দিতে জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সকলের ভিতর দিয়া হালীর স্বভাবিক কবি-শক্তি সম্বন্ধে গালীবের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। তিনি হালীকে কাব্য-চর্চ্চার উপদেশ দিয়া বলেন যে যদি তিনি কবিতা হইতে সরিয়া থাকেন, তবে ইহার দিকে আপন মনের স্বাভাবিক ঝোঁকের প্রতি অন্যায় জ্ঞাপন করা হইবে। গালীবের মত একজন বিখ্যাত কবির এ হেন উৎসাহে দিল্লীতে থাকিয়াই তিনি গোটা দুই গজল রচনা করেন। দিল্লীতে তিনি উত্তম সাধনার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই কিন্তু পরে বুলন্দসহর জেলান্তর্গত নবাব মোস্তফাখানের সহিত অবস্থান সময়ে তিনি কাব্য-চর্চ্চার সহায়ক অতি চমৎকার ক্ষেত্র দেখিতে পান। সিপাহীবিদ্রোহের পর নিস্তেজ জীবনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পানিপথে অবস্থিতির জন্য যাইবার পথে মোস্তফাখান কর্ত্তৃক তদীয় সহচররূপে থাকিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তথায় ৭।৮ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সম্ভ্রান্ত পুরুষ নিজেও একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তিনি পার্শীতে "হস্‌রতী" উর্দ্দুতে "সেফ্‌তা" নাম দিয়া লিখিতেন। তিনি প্রথম দিল্লীতে "মমিনের" শিষ্য ছিলেন। মমিনের মৃত্যুর পর হইতে গালীবের সমীপে নিজের রচনা সমর্পণ করিতেন। সেফ্‌তার সাহচর্য্যে ও অনুপ্রেরণায় হালীর এত কালের অকথিত প্রতিভা স্ফুটতর হইবার এক বিরাট ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইল আর সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে প্রদীপ্ত হইতে চলিল। সেফ্‌তার কবিতার সাথে হালীর কবিতা গালীবের সমীপে প্রেরিত হইত; কিন্তু গালীবের শুদ্ধিতে হালীর কবিত্বশক্তি ততদূর উন্নীত হয়নাই যতখানি হইয়াছে সেফ্‌তার অনুপ্রেরণায়। সেফ্‌তা অত্যুক্তি পছন্দ করিতেন না, তিনি নিজের রচনায় সত্য ও স্বাভাবিকতা ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সাধারণ ও সত্য ঘটনাসমূহকে সঠিক অবস্থায় বিবৃত্তির ভিতর দিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেন। এই দিক দিয়া তাঁর আদর্শ হালীর অন্তরে স্থায়ী গভীর ছায়াপাতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহা হালীর আপন আদর্শরূপে পরিণত হয়। হালী ইহাকে তাৎপর্য্যে সংস্কৃত করিয়া লয়েন এবং সাধনাতে সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন।

জাহাঙ্গীরাবাদে অবস্থিতিসময়ে সম্ভবমত সহজ অথচ সরল ছন্দে ভাষায় কবিতা লিখিবার যেই অনুপ্রাণিত আগ্রহ হালীর মনে বিপুল হইয়া উঠে, সেফ্‌তার লোকান্তর গমনের পর লাহোরে পঞ্জাব-সরকারের বুক-ডিপোতে একটী চাকুরী-প্রাপ্তিতে তাহা

আর একটু বেগ প্রাপ্ত হয়। বুক-ডিপোতে তাহার কর্ত্তব্য ছিল শুধু ভাষার প্রতিপত্তি-কল্পে শিক্ষাবিভাগের ইংরেজী পুস্তক সমূহের উর্দ্দু অনুবাদ ও পুনঃ সংশোধন করা। চারি বৎসর যাবৎ তিনি সেই কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। তথাকার অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী কালে তদীয় জীবনে অতি প্রয়োজনে লাগিয়ছিল। সেখানকার কার্য্যপ্রণালী জীবনের মহা উদ্দেশ্য সাধনের পথে অতি দরকারী পাশ্চাত্য প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান ভাষার সম্পর্কে তাঁহাকে আসিতে দেয়, এবং অনুবাদের ভিতর দিয়া যথাসম্ভব ইংরাজী জ্ঞানলাভে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে নানা অবস্থান্তর ক্রমান্বয়ে হালীর ভাবী মহিমময় সাহিত্যিকজীবনের সম্মুখে নানা সম্পদ, আকাঙ্ক্ষা ও উপায়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।

আবদুল কাদের।

দান।

"রম্‌জান-ঈদ-দিবসে আজিকে কে করিবে কিবা দান ?"
নবাব জহুর শুধা'ল একথা রাজসভা মাঝখান।
কহিল উজির,—"করি জিয়াফৎ মৌলবী আছে যত,
করা'ব ভোজন এ' ঈদের দিনে আপন সাধ্যমত।"
দরবার-কাজী কহিলা গরবে,—"ওহে দুনিয়ার স্বামী,
মুলুকের যত পীর-দরবেশ ভোজন করা'ব আমি।"
কহিলা জহুর ক্রীতদাসে ডাকি' "কি,—করিবি তুই দান ?"
কহিল বান্দা,—"কি আছে আমার শুধু এই দেহ খান।"
নবাব জহুর ভাষিল রোষিয়া,—"ত্রিশদিন করি' রোজা,
ঈদের দিবসে না করিয়া দান বহিবি পাপের বোঝা ?"
একথা শুনিয়া কহিল বান্দা নয়ন করিয়া থির,—
"আর্ত্তের লাগি' দিবে এই দাস এক ফোঁটা আঁখিনীর।"

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে মৌলিকতা।

পুষ্প অপূর্ব্ব সুন্দর। বিশ্বের প্রত্যেকটী ছন্দ, সৌরভ, লালিত্য সুসঙ্গত ও সুবিন্যস্ত ভাবে পুঞ্জীভূত করিয়া বিধাতা পুষ্পের অপূর্ব্ব তনুর সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশের বিরাট উদারতা, স্বর্গের বিমল শান্তি, বসন্তের প্রাণময় আনন্দ, নারীর প্রাণহানা কটাক্ষ, শিশুর প্রাণখোলা হাসি—বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রত্যেকটী অঙ্গ পুষ্পের অঙ্গে জড়ীভূত। ভাবুক কবি তাহার সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যময়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি দেখিতে পায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অথবা সমালোচক? সে পুষ্পের প্রত্যেকটী দলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া স্বকীয় কষ্টিপাথরে পরখ্ করিয়া উদ্ভিৎতত্ত্বে (না অদ্ভুততত্ত্বে ?) তাহাদের স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকের এই নির্ম্মমতায় ব্যথিত হইয়া কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখিয়াছেন—"Scientists peep and botanise their mother's grave.—" কবি এবং ঔপন্যাসিক বিশ্বের সমস্ত কমনীয় ভাবকে তুলির আঁচড়ে আঁকিয়া যান। যাঁহারা ভাবুক, সেই আলেখ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার প্রাণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা শুধু সেই সৌন্দর্য্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন এবং দোষগুণ না জানিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহেন। কিন্তু নিন্দুক সমালোচক সেই আলেখ্যের খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করিয়া কুসুমের কীট-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। উপভোগ করিবার মত শক্তি যাহাদের নাই, সমালোচনা করিয়া দোষ নির্ণয়ের ক্ষমতা দিয়া ভগবান যেন তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে উপভোগ না করিতে পারিলে সমালোচনা করা যায় না।

মানুষের জানিবার যাহা শক্তি, জগতে যাহা জানিবার আছে তাহার তুলনায় অনেক তুচ্ছ—নগণ্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া জানিলেও তাহা শেষ হইবে না। মহাবিজ্ঞ নিউটন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"আমি জ্ঞানসমুদ্রের সৈকতভাগে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।" মানবের জ্ঞানের মাপকাঠিতে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অসীমতা মাপিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের পুরাতন যুগের মনীষীদিগের চিন্তাশক্তি, ভাবিবার ক্ষমতা, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অপূর্ব্ব সম্পদ—বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। শত শত বর্ষ হইতে মানুষের চিন্তাধারার যে প্রবাহ চলিয়াছে সাহিত্য তাহাকে স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে নিজের বুকে ফলাইয়া নিয়াছে। সাহিত্যের পুরাতত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন মনীষীদিগের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থরাজি। সে সব আলোচনা করিয়াই আমরা সাহিত্যে নূতন ভাব ও জ্ঞানের আমদানী বুঝিতে পারি। বর্ত্তমানে সাহিত্যক্ষেত্রে সকলেই সমস্বরে সমতানে চীৎকার তুলিয়াছেন—"সব মামুলী, সব মামুলী—নূতন চাই, মৌলিক রচনা চাই। কিন্তু বিশ্বের অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের

কিয়দংশ মন্থন করিলে বুঝা যায় চিন্তার উপযুক্ত প্রায় সকল বিষয়ই ইতঃপূর্ব্বে ভাবা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালে মৌলিক রচনা অথবা নূতন সৃষ্টি আশা করা বাতুলতা মাত্র। পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া যে সব চিন্তা ও ভাব একটু বেশী পুরাতন হইয়া গিয়াছে তাহাকে নূতন রঙে আঁকিয়া নূতন মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিলে আমরা তাহাকে নূতন বলিয়া আদর করিতে পারি কিন্তু তাহাকে "মৌলিক" অভিধানে অভিহিত করিতে পারিনা। মৌলিক রচনা পাওয়া অতি দুর্ল ভ।

'গ্যে'টে' তাঁহার "Reflections and maxims"এ লিখিয়াছেন,—"চিন্তার উপযুক্ত সকল বিষয়ই ইতঃপূর্ব্বে ভাবা হইয়া গিয়াছে। এখন সেই পুরাতন কাসুন্দীই ঘঁটিতে হইবে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'।" যাহাই ভাবিতে যান তাহাই পূর্ব্বে একজন ভাবিয়া গিয়াছেন দেখিয়া হতাশ হইয়া গ্যে'টে "La Bruyeres"এ বলিয়াছেন,—'All is said." ভল্টেয়ারও তাই যাহা কিছু দেখিতেন বলিতেন,—"সবই নকল।" সুতরাং বাধ্য হইয়াই বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হয়,—'Thoughts like energy and matter are indestructible'—ভাবের বিনাশ নাই।

জগতের সকল সাহিত্যেই ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম বাংলা সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা যাক্।

বাংলার আদিকবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—তারপর গোবিন্দদাস, লোচনদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব-কবি বাংলা সাহিত্যকে অমূল্য রত্নরাজী উপহার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভাবুক জানেন শেষোক্ত কবিগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সিদ্ধ অনুকারী মাত্র। ভাবে ও ভাষায় তাঁহারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাছে "খাইয়া মানুষ।" পরবর্ত্তী যুগের কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু সপ্রমাণ হইয়াছে বিদ্যাসুন্দর ইতঃপূর্ব্বে অন্য এক কবির খাতায় স্থান পাইয়াছিল। মাইকেলের কাব্যাবলী যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পূর্ব্বকল্পিত কল্পনা-প্রসাদাৎ তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "পাণিপথের" কবি যে "পলাশীর যুদ্ধের" কবির ঘরে সিঁদ কাটিয়াছেন ইহা দুইটী বহি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে একটী ছোট ছেলেও ধরিতে পারিবে। পাণিপথের ইতিহাস হইতে কয়েকটী প্লট ধার করিয়া "পলাশীর যুদ্ধের" ভাষার একটু ভোল ফিরাইয়া দিলেই পাণিপথের রচনা শেষ হইয়া যায়। কোন কোন স্থানে "পাণিপথে" ও "পলাশীর যুদ্ধে" লাইনে লাইনে মিলিয়া যায়। কবির রাজা স্বয়ং সেক্সপীয়র পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের রচনা লাইনকে লাইন তুলিয়া দিয়াছেন—সুতরাং পাণিপথের কবিকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না।

আবার বাংলার সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বহিগুলি একটু ঘোলাইয়া দেখিলে মনে হয় তিনি স্কটের নিকট হইতে প্লট ধার করিয়া বাংলাসাহিত্যে নূতনত্ব আনিয়াছেন।

দুর্গেশ-নন্দিনী ও আইভান্‌হো পাশাপাশি রাখিয়া পড়িয়া দেখিলে মনে হয় দুইটী বহি যেন এক ধাতু দিয়া গড়া। তিলোত্তমা ও রেবেকার চরিত্রের সাম্যতা পাঠকের মনে কৌতুহলের উদ্রেক করে। ওসমান ও Bron de Gilbertএর চরিত্রে অনেকটা সাদৃশ্য আছে; তবে ওস্‌মান Bron de Gilbertএর মত এত ক্রুর প্রকৃতির ছিলেন না যদিও Bron de Gilbert, "রোয়েনা" এবং ওস্‌মান "আয়েষাকে" ভালবাসিতেন। আয়েষা ও রোয়েনার চরিত্র খাপে খাপে মিলিয়া যায়। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে বুঝাযায় রোয়েনার স্থান আয়েষা অপেক্ষা অনেক উচ্চে; রোয়েনার চরিত্র আয়েষা অপেক্ষা অনেক পবিত্র—অনেক মধুর। আত্মত্যাগ সম্পর্কে আয়েষা ও রোয়েনা প্রায়ই এক ধরণের। রোয়েনা যদিও আইভান্‌হোকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত তথাপি রেবেকার দিকে চাহিয়া সে কোন দিন প্রকাশ করে নাই যে সে আইভান্‌হোকে ভালবাসে। পাছে তাহার গুপ্ত প্রেম আইভান্‌হোর কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় সে নিরন্তর সন্ত্রস্ত থাকিত। কিন্তু আয়েষার চরিত্রে এই মাধুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্দীশালায় আয়েষা ওস্‌মানকে বলিয়াছেন,—"এখনও বলি ওস্‌মান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" আইভান্‌হো ও জগৎসিংহের চরিত্রেও অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন যে তিনি দুর্গেশ-নন্দিনী লিখিবার আগে আইভান্‌হো পড়েন নাই। হইলেও হইতে পারে; তবে তিনি যে ভাবা কথা ভাবিয়া গিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে সাহিত্যে মৌলিকতার প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে কবিদিগের বিষয় ভাবিতে গেলেও ঠিক এই কথাই খাটে। বিদ্যাসুন্দরের মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। মাইকেলের কাব্যাবলীতে ভাবের নূতনত্ব খুব কমই আছে। স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মূলসুরে বৈষ্ণবের বাঁশের বাশী ও বিদেশী ক্লারিওনেটের ঐক্যতান দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকাব্যের অনেকগুলি ভাবের জন্য বৈষ্ণব কবিগণের নিকট ঋণী। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির-গানে "হুড্" ও "হংগল্-ডস্‌বির" অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে টের পাওয়া যায় প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের বাহাদুরী একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একচেটিয়া নহে। কারণ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। বর্ত্তমান কালের কবি ও ঔপন্যাসিকদের শতকরা নিরনব্বই জন সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের নিকট ঋণী। এ সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় সাহিত্যে মৌলিকত্ব এবং নূতনত্ব কত দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যের আখ্‌ড়া খানাতাল্লাসী করিয়া মৌলিকত্বের আভাষ তথায় কতটুকু আছে বুঝা গেল। এখন বিদেশী সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা যাক্। যে "গলিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত" (Gulliver's Travels) লিখিয়া Dean Swift অমর, তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের ঘরে সিঁদ কাটিয়াছেন। তাঁহার রচনায় তিনি "Voyages of Cyrano De Burgae" হইতে অনেক প্লট ধার করিয়াছেন এবং Godwin এর "Man in the Moon" হইতে লাইনকে লাইন তুলিয়া নিজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। আর সকলকে ফাঁকি দিয়া গেলেও "ওয়াটন" তাঁহাকে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। Godwin আবার তাঁহার লেখার জন্য 'Syrano'র কাছে ঋণী। ট্যাসো সেখ সাদীর লেখা হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আবার সেখ সাদীর ভাব ও চিন্তার ধারা "তুরস্ক-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান" হইতেই প্রবাহিত। বস্তুতঃ সেখ সাদী স্বকীয় অপূর্ব্ব রচনার জন্য "তুরস্ক-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের" নিকট ঋণী। Milton, Chaucer, Pope প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণ ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট হইতে ভাব ও প্লট ধার করিয়াছেন। নূতন আদর্শের কবিতা উদ্ভাবন করিয়া যে ইতালীয় কবি Plutarch অমর তাঁহার কবিতার ছন্দেও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের তাণ্ডব নৃত্য দৃষ্ট হয়। ইতালীর আদি ঔপন্যাসিক Bakasio পর্য্যন্ত তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের লেখা হইতে প্লট ধার করিয়াছিলেন। ফরাসী রঙ্গনাট্যের ওস্তাদ "মলিয়র" মৌলিকতার জন্য দেশজোড়া আদর পাইয়াছিলেন; কিন্তু Menage তাঁহার নামে চুনকালী দিয়াছিলেন। Victor Hugo তাঁহার "ভিন্‌গাফ্‌জিনের" জন্য ডুমহ্সের পুঁজিতে হাত বাড়াইয়া ছিলেন। এ যুগের "ক্যনান ডায়ল" ও কম আদর পাইতেছিলেন না কিন্তু ভাগ্যে "এড্‌জার এলেনপো" ছিলেন নতুবা Sharlock Holmes এর সৃষ্টি অসম্ভব হইত। Mary Correlia "Sorrows of Satan" এবং "Ziska" প্রভৃতির প্লট পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভাণ্ডার হইতে নেওয়া। সাহিত্যে মৌলিকতার অভাবে এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি নিরন্তর দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ঘোলাইয়া দেখিলে মনেহয় লেখকেরা সবাই "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।"

তবে চোর দুই রকমের। এক রকম—গয়না চুরি করিয়াই যাহারা মহাজনের দোকানে বিক্রী করিতে যায়—তাহারা হাতে নাতে ধরা পড়ে। আর এক—চোরাই মাল আগে গালাইয়া নেয়, তার পর বিক্রী করিয়া বেমালুম সাধু বনিয়া যায়। গালাই করা গয়না কেউ চিনিতে পারে না সুতরাং শেষোক্ত রকমের চোর ধরা শক্ত হইয়া উঠে।

সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রথম শ্রেণীর চোরেরা ধরা পড়িয়া সমালোচকের কলমের আঘাতে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অচিরাৎ গা ঢাকা দেয়। আমরা সম্মান করি শেষোক্ত চোরদের যাঁহারা অন্যের জিনিষ চুরি করিয়া তাহার রঙ ফিরাইয়া পরস্বের মধ্যে নিজস্বের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলেন।

নূতনত্ব এবং মৌলিকত্ব হিসাবে কোন সাহিত্যেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বে একজন ভাবিয়া গিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া ভাবিয়া নূতন রঙে আঁকিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপহার দিলেই তাহা সাহিত্যক্ষেত্রের পূজারীদিগের নিকট আদর পাইয়া থাকিবে। তবে যাহা-তাহা একটা কিছু—তিনবহির মধ্য হইতে তিনটী কথা জোড়াতালি দিয়া একটা কাঠাম (foundation) সৃষ্টি করা উচিত নহে। কারণ সেই কাঠাম অসত্যে ও প্রবঞ্চনায় পূর্ণ—ধূয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যে এই রকম মামুলী মৌলিকত্বহীন রচনার আদর নাই। মিথ্যা প্রবঞ্চনার উপর সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত নহে। সত্যই সাহিত্যের একমাত্র আশ্রয়। সত্য, নির্ম্মলতা, সুসঙ্গতি এবং সুবিন্যাসেই সাহিত্যের জীবন। সাহিত্য সুন্দর, পবিত্র এবং নির্ম্মল।

শ্রী বীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অস্ফুটের ডায়েরী।

"কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে—"

—রবীন্দ্রনাথ।

* * * আমি এসেছি গো, আমি এসেছি। আমার অস্ফুট কণ্ঠের অজানা বাণী নিয়ে, তোমাদের এই সঙ্গীত-মুখর মঙ্গল-আসরে আমি এসেছি। তোমাদের ঐ কুসুমিত উদ্যানে, আজ শরতের এই আনন্দোৎসবে, হাস্য-মুখর ফুলবালাদের সবুজ ঘাসের মাদুর পাতা মজ্‌লিসে আমিও এসেছি—আমার অস্ফুট রূপের আকুলতা নিয়ে, আমার রুদ্ধ গন্ধের উচ্ছ্বাস নিয়ে। বিশ্বের সকল সঙ্গীত, সকল সৌন্দর্য্য যে আজ আমায় পাগল ক'রে ফেলেছে, তা'ই আমি আমার অস্ফুট গান নিয়েই, অস্ফুট রূপ নিয়েই ছুটে এসেছি—তোমাদের এই পরিস্ফুট রূপ-গানভরা বিশ্ব-সভায়। জানি না কোথায় আমার এ বুকভরা উচ্ছ্বাসের, প্রাণভরা আকুলতার পরিণতি!

* * * * *

বাঃ! আজকের এই প্রভাতটা কি সুন্দর! গত রজনীর অশ্রান্ত বর্ষণের পর 'ভেজা ঘাসের পাতায় পাতায়', সিক্ত ধরার সরস শ্যামলতায় সূর্য্য কিরণ পড়েছে। মেঘ-মুক্ত

আকাশ অরুণের দীপ্ত গরিমায় হাস্‌ছে। কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলেরা সব তরুণ রবির চঞ্চল চুম্বনে রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের আকুল স্রোত ব'য়ে চলেছে। কি মনোরম! কি পরিপূর্ণ! কি সার্থক!—শরতের এই নবীন আয়োজন এই নবীন বিকাশ! ভোরের বাতাস আজ চারিদিকে চন্দন লেপে দিয়েছে! গাছে গাছে পাখীর কলতান, দিকে দিকে আজ সুরের আকুলি বিকুলি! ভোরের পাখী আজ সুরের লহরে আকাশ-ভুবন ছেয়ে ফেলেছে। পাশের ঘর হ'তে হার্ম্মোনিয়মের সাথে একটা প্রাণ মাতানো সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা ভেসে আস্‌ছে। পাখীর কলতানের ভেতর এই শোনাচ্ছে বেশ সুন্দর। আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমিও একটা গান করি। গানের আভাষ পেলেই আমার প্রাণ খুলে গাইতে ইচ্ছে করে। ভুলে যাই যে কণ্ঠ আমার অস্ফুট। গান অস্ফুট বলেই বোধ হয় গাইবার একটা তীব্র ইচ্ছে আমায় মাতাল ক'রে তুলেছে। বুকের ভেতর আমার যে অবিশ্রান্ত গানের বন্যা বইছে, যে একটা বিপুল গান আমার বুক থেকে বেরোবার জন্য অহরহ গুম্‌রিয়ে উঠ্‌ছে তারই উচ্ছ্বাস আমায় মাঝে মাঝে উন্মাদ ক'রে তোলে;—আর তখনি ব্যর্থতার একটা ব্যথাভরা ব্যাকুল ক্রন্দন আমার অস্ফুট কণ্ঠ ছাপিয়ে ওঠে। আমি যে গাইতে পারি না। বুকে আমার অনেক গান ও অনেক সৌন্দর্য্য,—কিন্তু তারা যে ভাষা পায় না, তারা যে ফুট্‌তে পায় না। ওগো! আমি যে অস্ফুট গো, আমি যে অস্ফুট! শরতের এই পাগল-করা রূপ-গানের পূর্ণ পরিস্ফুটতায় আমি যে অস্ফুট কলি, আমি যে অস্ফুট গান; বুকে যে আমার অস্ফুট রূপ-গানের অতৃপ্ত কামনা!

*   *   *   *

আজকের এ রাত্রিটা তার শরতের বিশেষত্বটুকুকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। এতটুকুও ফাঁক রাখেনি, যাতে ক'রে কেউ বল্‌তে পারে—এ শরতের রাত্রি নয়। চাঁদে তার শরতের হাসি, জ্যোছনায় তার শরতের ঢল ঢল লাবণি, আকাশে তার শরতের প্রশান্ত নীলিমা। আমার প্রাণে আজ একি আনন্দ! আমি যেন আজ কোন্ এক আনন্দের সাগরে স্নান ক'রে এসেছি। চোখে যেন কে আজ আমার আনন্দের অঞ্জন এঁকে দিয়ে গেছে। যা দেখ্‌ছি, তাই সুন্দর, তাই আনন্দময়! আমার চারিদিকে যেন একটা অবিশ্রাম আনন্দহিল্লোল নৃত্য কর্চ্ছে! কি সুন্দর—আজকের এই রাত্রিটা!

এদিকে তোমরা আবার একি কর্চ্ছ ভাই? রাশি রাশি ফুল এনেছ; ধূপ ধূনায় ঘর আমোদিত করেছ, শুদ্ধ গম্ভীর স্তব গান কর্চ্ছ—এ দিয়ে কি হবে ভাই? এঁ্যা! পূজো! মায়ের পূজো! বাংলা-মায়ের পূজো কর্চ্ছ তোমরা! কেউ ডালা ভরে ফুল সাজিয়ে

এনেছ, কেউ শুভ্র যূথির মালা গেঁথে এনেছ, কেউ এনেছ বেলী-গোলাপের গুচ্ছ। কেউ এনেছ,—
মায়ের পায়ের মল,
কেউ এনেছ বালা,
আবার কেউ এনেছ
হৃদয় নিংড়ে ভক্তি—
চন্দন অঞ্জলি।

চোখে তোমাদের প্রেম-ভক্তির পবিত্র দীপ্তি,* বুকে তোমাদের মাতৃপূজার বিমল তৃপ্তি, মাথায় তোমাদের মায়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। বাংলাভরা আজ বাংলামায়ের পূজো, জগৎভরা আজ বাংলামায়ের স্তবগান। আমায়ও নাও ভাই! তোমাদের ঐ রাশি রাশি ফুলের ভেতর আমায়ও আজ নাও ভাই। আমায়ও আজ তোমাদের হাতের অর্ঘ্য ক'রে মায়ের চরণে ফেলে দাও ভাই! ওগো! আজ আমার অস্ফুট জীবনকে বিকশিত ক'রে, পূর্ণ ক'রে, সফল ক'রে দাও গো—তোমাদের ঐ নিপুণ হাতের মঙ্গল-স্পর্শে। আমায় আজ মায়ের পূজোর যোগ্য ক'রে দাও। আর ঐ কেগো তোমরা মায়ের বন্দনা গাইছ;—আমার ছিন্ন তন্ত্রীর অস্ফুট তারকে তোমরা আজ বাজিয়ে তোল গো, তোমরা আজ তার রুদ্ধ গানের বিপুল উচ্ছ্বাসকে মুক্ত ক'রে দাও। ওগো! তাকে মায়ের গানের যোগ্য ক'রে দাও। কি? দেবে! আমার এই অস্ফুট জীবনকে ফুটিয়ে দেবে তোমরা! ও মা! কি তৃপ্তি!!

—অস্ফুট।

পরিচয়।

"তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।" ফুল আপনার যা' কিছু সবি বাতাসের বুকে বিলিয়ে দিয়েই আপনার অস্তিত্বের সার্থকতা সম্পাদন করে। এই বিলানোতেই তার তৃপ্তি, এ'তেই তার আনন্দ। কুঁড়ির ভিতরে গুমরে-কাঁদা গন্ধকে প্রকাশের অভিসারে পাঠানোতেই ফুলের জীবনের সার্থকতা। প্রাণ যখন আপনাকে বিশ্বে বিলিয়ে দেয়, তখনি তার সার্থকতা লাভ হয়। কিন্তু মানুষের নিজের বিশেষত্ব এবং মনের প্রতিচ্ছবি বিশ্বের সাম্‌নে ধর্‌তে হ'লে চাই একটা অনুকূল অবসর—একটা অনুকূল আব্‌হাওয়া। আত্মপ্রকাশের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সকলের হৃদয়েই আছে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই প্রেরণাই সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যানুশীলনের মূলে। এই প্রেরণার ইন্ধন যোগায় একটা অনুকূল বাতাস, একটা অনুকূল ক্ষেত্র, অনুকূল আব্‌হাওয়া— যাকে বলে Literary atmosphere. এই আব্‌হাওয়ার আমেজ লেগে মানুষের সুপ্তি-শিথিল প্রতিভা পরিপূর্ণতায় উচ্ছল হ'য়ে উঠে। আমাদের মনের গোপন কোণের আকুল ভাবকে গ্রহণলাগা যক্ষপুরীর সংস্কারাচ্ছন্ন গণ্ডীর মাঝে বন্দী ক'রে, নিজকে বিশ্বের সবার কাছ থেকে হরণ ক'রে রেখে আত্মবঞ্চনা করেছি। তারি জন্য একট অনুশোচনা, তারি জন্য প্রাণের একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যেন আমাদের হৃদয়ের অস্ফুট অথবা অর্দ্ধস্ফুট ভাবগুলিকে তুলির আঁচড়ে বিশ্বের সাম্‌নে মূর্ত্তিমান্ ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা পাচ্ছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বোধহয় এজন্যই পত্রিকাখানিকে অস্ফুট ভাবের বাহন মনে ক'রে তার নাম অস্ফুটই রেখেছিলেন।

১৩৩০ সনের ভাদ্র মাসে শরতের এক বৃষ্টিভেজা প্রভাতে তরুণ রবির চঞ্চল চুম্বনে আরক্ত হ'য়ে অস্ফুট জন্মেছিল। পাখীর কলগানে, প্রভাত-বায়ুর উন্মত্ত প্রণয়-প্রলাপে, উষার লাজুক আলোর আকুল পীড়াপীড়িতে অস্ফুটের কণ্ঠে সুর ফোটেনি। ক্ষণিক-দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গেয়ে সময়ের বুকে একটা কালির পোঁচ রেখে সে ঝরে পড়্‌ল—অস্ফুট চিরদিনের মত অস্ফুটই র'য়ে গেল।

আজ তিন বছর পরে অস্ফুটের জীর্ণ-কঙ্কাল মূর্ত্তির খোলস প'রে আমাদের প্রাণে নূতন প্রেরণা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। আমরা তাই তার ঝড়ঝরা পাপড়ীগুলিকে তুলির পোঁচে রঙীন্ ক'রে তুলে তাকে প্রকাশের অভিসারে পাঠাচ্ছি। অস্ফুটের মনের বাসনা কতদূর চরিতার্থ হয় জানি না। সাফল্য ভগবানের হাতে।

অস্ফুটের সুপ্তি-শিথিল দেহে শান্তিবারি-সিঞ্চনে নবজীবন দান কর্‌লুম। আমাদের পাছে যাঁরা আস্‌ছেন তাঁরাও যেন আমাদের রোপিত এই মহীরুহকে সরসতা ও সজীবতা দানে চিরন্তন ক'রে রাখেন—তাঁদের কাছে এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

আমাদের কথা।

অস্ফুটের প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণের পরীক্ষা থাকায় অনেক বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইয়াছে। তাঁহারা অচিরে হোষ্টেল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এজন্য খুব তাড়াতাড়িতে আমাদের পত্রিকাখানি বাহির করিতে হইল। এজন্য পত্রিকাখানি আকারে খুব ছোট হইল এবং অনেক ভুল-ত্রুটিও রহিয়া গেল। আশা করি সময়ের অত্যল্পতা বিবেচনা করিয়া সুধী পাঠকবৃন্দ আমাদের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিবেন না।

সাধারণ পাঠাগার—আমাদের সাধারণ পাঠাগার আমাদের একটী গৌরবের বিষয়। বাংলা ইংরেজী সাময়িক প্রায় সবগুলি প্রসিদ্ধ পত্রিকাই আমাদের সাধারণ পাঠাগারে আছে। দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৪, সাপ্তাহিক ৫, এবং মাসিক ২০ খানা। এতদ্ব্যতীত দাবা, 'লুডু' 'স্নেক-এণ্ড-লেডার' 'হেল্‌মা' প্রভৃতি খেলার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। আমাদের পাঠাগার প্রত্যহ ৫ টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। হোষ্টেলের প্রায় সমস্ত ছেলেই রীতিমত পাঠাগারে পত্রিকাপাঠ ও ক্রীড়াদিতে চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। সেক্রেটারী খন্দকার লুত্‌ফের রব্বাণী ও এসিষ্টেন্ট্‌ সেক্রেটারী শ্রীরমনী মোহন রায়ের পরিচালনায় পাঠাগারের কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে।

খেলাধুলা—আমাদের হোষ্টেলের ছাত্রগণ নিয়মিতভাবে ফুটবল, ক্রীকেট, বাস্কেটবল, হকি, টেনিস্‌, ভলি, কপাটী, দাড়িয়াবান্ধা প্রভৃতি বিবিধ খেলায় উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অনেকেই নিয়মিতভাবে মুগুরভাঁজা, 'প্যারালালবার' প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়া থাকেন। কলেজের ফুটবল ও হকি টীমের প্রায় অধিকাংশ খেলোয়াড়ই আমাদের হোষ্টেলের। এবার বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুলের ফুটবল টীম আমাদের সহিত খেলায় তিন গোলে হারিয়া গিয়াছে। এবার "শঙ্খনিধি লিগ্‌ শিল্ডের" খেলায় আমাদের কলেজ টীম উয়ারী ভিন্ন অন্য সমস্ত টীমকে হারাইয়া শিল্ড লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক খেলায় আমাদের হোষ্টেলের খেলোয়াড়গণ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এবার কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় আমাদের হোষ্টেলের ছাত্রগণই অধিকসংখ্যক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

সাহিত্যসেবা—আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে আমাদের হোষ্টেলের ছাত্রদের লেখাই বেশী। আমাদের অনেকেই বাংলার বিবিধ সাময়িক মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন।

তবে আমাদের সাহিত্য-সমিতি বলিয়া কিছু ছিলনা! এখন হোষ্টেলের ম্যাগাজিন বাহির হওয়াতে এদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ—আমাদের হোষ্টেলের ছাত্রসংখ্যা খুব কম। গত জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষে আমাদের হোষ্টেল হইতে প্রায় ৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবক শান্তিরক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। মাধবগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ সেথায় গিয়া সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মঠে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

উপসংহার—সময়াভাবে এবং স্থানাভাবে আমরা অনেকের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশিত করিতে পারি নাই। যাঁহাদের লেখা পত্রিকায় বাহির হয় নাই সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান সম্বন্ধে তাঁহারা যেন নিরাশ হইয়া না পড়েন। হোষ্টেলের যে সব ছাত্রবন্ধুর ঐকান্তিক আগ্রহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে "অস্ফুট" প্রকাশিত হইল তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অনেক প্রতিকূলতা-নিবন্ধন আমরা এ বৎসর পত্রিকাটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিলাম না। আশা করি আমাদের পরবর্ত্তী ছাত্রবন্ধুগণ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত ও সাফল্য-মণ্ডিত করিবেন।